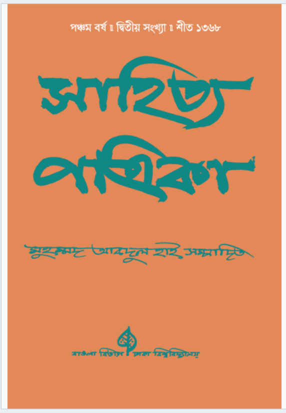

Vol. 5 | No. 2 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য

Volume	5
Issue	2
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hasan Hafizur Rahman
Published online	December 16, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i2.4
Pages	85-148
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য

হাসান হাফিজুর রহমান

প্রথম পর্যায়

॥ ১ ॥

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে লেখা কবিতাসমষ্টির মধ্যেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সম্পর্কিত বিচার সীমাবদ্ধ রাখা যেত তাহলেই বোধ করি আমাদের সাম্প্রতিক কাব্য-উদ্যমের সঠিক মূল্যায়নে সব দিক থেকে সুবিধে হত! কিন্তু রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে এই যে, ভাগ-বাটোয়ারার ফলে পাকিস্তানী সব কবিই তাঁদের পূর্বতন সকল সম্পদ নিয়েই পাকিস্তানের অংশে পড়েছেন; সুতরাং স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কালে তাঁদের লেখা কবিতাসমূহও পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্যে বিনা প্রশ্নেই স্থান করে নিয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক কাব্য-আলোচনাকে বাধ্য হয়েই স্বাধীনতার পূর্বাপরে বিস্তৃত হতে হয়—এর কোন গত্যন্তর আছে বলেও মনে হয় না!

কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ধরনের আর কোন নজীর আছে কিনা, আমার ঠিক জানা নেই। তবে এমন মীমাংসা বেশ কিছুটা কৌতূহল উদ্রিক্ত করে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই ব্যবস্থার ফল যে আমাদের কাব্য-সাহিত্যের কিছুটা রাশভারী খতিয়ানের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় এই যে, এমন ধরনের সমন্বয়ের প্রকৃত প্রেরণাটা কি এবং এর তাৎপর্যটাই বা কোথায়?

এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিন্যাসের পক্ষে কিছুটা যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সেটা হল, কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি যা আলোচ্য পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যে স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তী কালে উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছে এবং যেসবের, সর্বাত্মক না

হলেও, কিছুটা নিয়ন্তা ভূমিকাও উভয় স্তরে বিদ্যমান। এই লক্ষণগত সমগোত্রীয়তা প্রাক-স্বাধীনতা কালে লিখিত পাকিস্তানী কবিদের কবিতা সাম্প্রতিক বিচারে অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রধান কারণ হতে পারে। তবে এ-ক্ষেত্রে একটি বিষয় কিছুতেই লক্ষ্য এড়িয়ে যেতে পারে না যে, আমাদের বর্তমানে গৃহীত কাব্য সম্পদের বেলায় উপরোক্ত ধরনের পূর্বাপর বিস্তৃত লক্ষণ কতিপয় অন্যতম লক্ষণ মাত্র—সমগ্র লক্ষণের প্রতিনিধিত্ব এরা করতে পারে না। কিন্তু তবুও আমাদের কাব্য বিচারে এই মানদণ্ডকেই স্বীকার করে নিতে হবে এই জন্য যে, এমন কতিপয় সাধারণ লক্ষণের ভিত্তির ওপরেই স্বাধীনতা-পরবর্তী কাব্য উদ্যমের মূল কাঠামোটা নির্ভর করে আছে।

উক্ত সাধারণ লক্ষণগুলোকে আমরা দুটো ভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম ঃ জাতীয়তাবোধমূলক লক্ষণ সমূহ, দ্বিতীয়ত ঃ সাধারণভাবে কাব্যে বিবর্তন-সঞ্জাত লক্ষণসমূহ। প্রথম লক্ষণ-গোত্রের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রচেতনার যোগ নিবিড়। সেই হেতু রাষ্ট্র গঠনের সাংগঠনিক ও কল্পনাশ্রয়ী আবেগ চঞ্চলতা থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালীন সংলগ্নতা পর্যন্ত এর প্রসার অনায়াসেই অব্যাহত হতে পারে। ফলে এতে একটি ধারাবাহিকতার সূত্র খোঁজা এবং এই প্রয়াসের ফলকে একটি একক কাঠামোয় সংযুক্ত করা অবান্তর কিছু নয়। দ্বিতীয় লক্ষণগোত্রের সঙ্গে রাষ্ট্র চেতনার যোগ প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যে মৌল উপাদান, মূল্যবোধ ও মনোভংগী এক যুগের কাব্যকে অন্যযুগে ঠেলে দেয় সেগুলোই এই গোত্রের কাব্য-প্রচেষ্টার নিয়ন্তা শক্তি। এর যোগ প্রধানতঃ সমাজবিন্যাস ও আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে। এইটেই আমাদের কাব্যের প্রধান ধারা। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাব্য ভুঁইফোঁড় নয়। একটি নিশ্চিত বিবর্তনের পথ ধরেই এ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেই হিসেবে বিকাশ ও বিবর্তন ধারায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেই এর যোগ খুব নিবিড়। তবু এ-ক্ষেত্রেও বিশেষ করে পাকিস্তানী কবিদেরই প্রাক-স্বাধীনতাকালে লেখা এই ধরনের কবিতাসমূহই শুধু আমাদের বিচার-সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কেন হয়ে থাকে তার অনেক কারণই হয়তো থাকতে পারে। আমার কাছে অন্ততঃ এর একটা বোধগম্য কারণ এই যে, এই ধারায় অনেক কবিই প্রাক-স্বাধীনতা যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও, তাঁরা এখনও লিখে চলেছেন—তাঁদের কাব্য সাধনাকে খণ্ডিত করে বিচার করা কোনক্রমেই ঠিক হবে বলে মনে

হয় না। আর তাছাড়া সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে আমাদের সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলন কি রূপ নিচ্ছে, কি ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে এবং এর সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরীদের সম্পর্কই বা কি এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকাই বা কি—এসকল সুস্পষ্ট করে জানার জন্যেও তাঁদেরকে সম্পূর্ণ করে গ্রহণ না করে উপায় নেই। এই পর্যায়ে আমাদের পাকিস্তানী পূর্বসূরীরাই বিশেষ গুরুত্বের অধিকার পাচ্ছেন এইজন্য যে, আমাদের সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয় ফ্যাক্টর।

আমাদের কাব্য সম্পদের সীমারেখার সংবিধান যাই হোক না কেন, এখানে আমি একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে নিতে চাই যে, দেশজ মাটি ও মানুষের রসে সিঞ্চিত নিশ্চিত উপাদানই কাব্যের খাঁটি উপাদান—নিজস্ব সময় ও শিকড়ে নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা থাকলে তবেই সে কাব্য গণ্ডীর সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে সার্বজনীনতা পেতে পারে। আর তাই দ্ব্যর্থহীন ভাবেই একথা সত্য, দেশজ মাটি ও মানুষের রসে সিঞ্চিত সার্বজনীন কাব্যই খাঁটি কাব্য, সর্বকালীন কাব্য এবং বিশেষ কোন ক্রাইটেরিয়ান নয়—বৈদগ্ধ্যের দৃষ্টিকোণই কাব্য বিচারের যথার্থ দৃষ্টিকোণ, সঠিক মাপকাঠি! জাতীয়তাবোধ মূলক উপাদানসমূহ একটি উত্থান-উন্মুখ সংগ্রামচঞ্চল জাতির সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই লক্ষণসমূহ একান্তভাবেই লক্ষ্যনির্ভর। লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সফলতা কি বিফলতার পরেপরেই এদের চঞ্চলতা ও সজীবতাও কমে আসে—এদের উদ্ভাবনার প্রেরণাও নিজে নিজেই স্তিমিত হয়ে যায়। তাছাড়া যতক্ষণ এই বোধ লক্ষ্যমুখী থাকে ততক্ষণও একটা প্রবণতা শীলতা এদেরকে আছন্ন করে রাখে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, মূলতঃ কাব্যের বহিরঙ্গ উপাদান এগুলো। এদের আন্দোলনী চাঞ্চল্যই এদের চরিত্রকে উৎকেন্দ্রিক করে তোলে—কখনো সংস্থিত কাব্য উপাদানে পরিণত হতে দেয় না। পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যে এই তথ্যের সমর্থনে যথেষ্ট কৌতূহল-উদ্দীপক নিদর্শন মিলবে! ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য আলোচনায় দুটি ভাগ নিজে নিজেই হয়ে পড়ে—একটি পটভূমিমূলক আর একটি সাম্প্রতিকতা-নির্ভর বিবর্তনমূলক। আমি অবশ্য আমাদের কবি ব্যক্তিত্বগুলির খেসারতে আমাদের কাব্যে এমন দুই খণ্ডে চুলচেরা বাটোয়ারা করতে যাচ্ছি না। আমাদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভাগের এমন একটা ভিত্তি রচিত হতে পারে, একথাটাই বলতে চাই মাত্র।

॥ ২ ॥

পূর্ব পাকিস্তানের অগ্রজ কবিরা কাব্যক্ষেত্রে আর তেমন সক্রিয় নন। গোলাম মোস্তফা এবং বেগম সুফিয়া কামাল যদিও লেখা বন্ধ করেন নি, তবু অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁদের সাম্প্রতিক কালের রচনা অনেকাংশেই বিভিন্ন ঘটনাকেন্দ্রিক। এর পেছনে বাইরের তাগিদ যতটুকু কাজ করছে, ভেতরের প্রেরণা ততটুকু ক্রিয়াশীল নয়। ফলে নিজস্ব কবিজীবনের উৎসরণের সঙ্গে এই রচনাগুলোর যোগ তেমন আছে বলে মনে করা যায় না। আবদুল কাদির ইদানীং লিখছেন না, জসীমউদ্‌দীনও তাঁর বিশিষ্ট ধারায় আর সক্রিয় নন। আর এক জন প্রধান কবি শাহাদাৎ হোসেন বছর কয়েক আগে ইহলোক ছেড়ে গিয়েছেন।

যে নামগুলো উল্লেখ করা হল পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্যে তাঁরা অগ্রজ। একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তি এঁদের কবিজীবনের বিকাশের সহায়ক হয়েছে। তাছাড়া এঁরা, সকলেই তাঁদের কাব্য-ভাবনার উপান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বলেই হয়তো সক্রিয়তাও হারিয়ে ফেলেছেন, সে কারণে এঁদের কবি জীবন সম্পর্কে একটি মীমাংসিত ধারণায় হয়তো এখন উপনীত হওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, দুটো সাধারণ বৈশিষ্ট্য এঁদের সবার মধ্যেই উপস্থিত। প্রথমতঃ, প্রকৃতি ও প্রেমের আকর্ষণে এঁদের মন উদ্বুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় অতীতের উজ্জ্বল অধ্যায়ের মধ্যে প্রেরণা খোঁজার প্রয়াস এবং ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও মহিমা সংযোগের প্রবণতা। প্রথমটির পেছনে আত্মগত সৌন্দর্য-চেতনা এবং দ্বিতীয়টির পেছনে সামাজিক জাগরণের প্রতি সজাগতাই প্রেরণা জুগিয়েছে। অবশ্য জীবন সম্পর্কিত মূল্যবোধই যে এ দুটো ধারণার মূল উৎস এতেও কোন সন্দেহ নেই।

১৯২০ সালের পর বাংলা কাব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং ব্যক্তি চেতনার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের হাতে সামাজিক প্রতিভূ হিসেবে মানুষের আত্মমূল্য এবং ব্যক্তি হিসেবে আত্মবিকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি বাংলা কাব্যে মননশীল পর্যায়ে পরিণতি লাভ করেছে। গঠনমূলক ধর্মচেতনার প্রতিফলনে, আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধনে, আত্মগত উপলব্ধির নিঃসঙ্কোচ অভিব্যক্তিতে, নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণে, সমাজ সম্পর্কিত সজাগতায় এই স্বীকৃতি বাংলা কাব্যের চেহারাকে দ্রুত পাল্টে দিচ্ছিল। এর মধ্যে নজরুল

আরেক বিপ্লব ঘটালেন। তিনি বাংলা কাব্যের এই মননশীল সজাগ প্রকৃতির ওপর বাস্তব জীবন সংগ্রামের উদ্যমবোধ এবং দায়িত্বচেতনা চাপিয়ে দিলেন। বাংলা কাব্যের detachment এ এল এক নিদারুণ জীবন সম্পৃক্তির চাঞ্চল্য। কবির পক্ষে দূরত্ব নিয়ে আর বিচ্ছিন্ন থাকা দায় হয়ে উঠল। এবং এই পথ ধরেই বাংলা কাব্যে আধুনিক কাব্যধারার নতুন জোয়ার বয়ে এল।

গোলাম মোস্তফা এবং শাহাদাৎ হোসেন নজরুলের প্রায় সমসাময়িক কবি। আবদুল কাদির এবং বেগম সুফিয়া কামাল এঁদের পরবর্তী স্তরে ১৯৩০-এর দশকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয় যে, নজরুলের সঙ্গে এঁদের প্রত্যেকের যোগ গভীর হওয়া সত্ত্বেও, এঁরা কেউই নজরুল-ধারার কবি নন। এমন কি, নজরুল-সম্পর্কিত সজাগতা এবং প্রতিক্রিয়াপন্নতা গোলাম মোস্তফার সবচেয়ে বেশী থাকা সত্ত্বেও, তিনিও নন। ফলে এঁদের কাব্যের পরিণতি সমসাময়িক আধুনিক কবিতার সঙ্গে কোন সংযোগ স্থাপিত করতে পারে নি। এবং অন্যপক্ষে যুগোপযোগী জীবন সম্পৃক্তির অভাবের ফলে আধুনিক কবিতার পূর্বসূরীর ভূমিকা গ্রহণের প্রশ্নও তাই এঁদের বেলায় ওঠে নি। অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না। কারণ তাঁদের মনোভংগী অনুযায়ী কবিসাফল্যই হল মূল কথা। সে বিষয়ে আলোচনার আগে আর একটি বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সেটা এই যে, এঁদের গঠনমূলক ধর্মীয় চেতনা অনেকাংশে অতীতপ্রীতি থেকে এসেছে। এর সঙ্গে বিশ্লেষণের নয় বরং আত্ম-উদ্বোধনের অনুভূতিটিই বিশেষভাবে জড়িত। এবং নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-যুগের বাংলা কাব্যের প্রাথমিক পর্যায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষণসমূহেই এই চেতনা পুষ্ট। এই পর্যায়ের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হল আধা সমাজ-সজাগতা, আধা দেশ ও লোক-সজাগতা এবং পরিপূর্ণভাবে ধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতি-সজাগতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রাথমিক সংগ্রামের স্তর পার হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে জীবনের সামগ্রিক গুরুত্ব চেতনার এবং কল্যাণের উৎসসমূহের স্তরে প্রবেশ করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল এবং অনেকাংশে আধুনিক কবিতার উৎসরণের সহযোগিতাও তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল ঃ বিশেষ করে আধুনিক কবিতার Rationalism-এর তিনি তো উৎসই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্য এ সত্য হলেও, রবীন্দ্র-বলয়ের কতিপয় কবির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ-প্রভাবিত সৌন্দর্যচেতনার গণ্ডী পার হয়ে আসা আর সম্ভব

হয় নি। ত<u>ঁ</u>াদের সবার সৌন্দর্যবোধে বিশুদ্ধতা হয়তো তেমন বজায় থাকে নি, কিন্তু মূলতঃ ধর্ম, সৌন্দর্য, প্রকৃতি, প্রেম ও অতীত চেতনার রাবীন্দ্রিক বলয়েই তাঁদের কবি জীবনের উদ্বোধন ঘটেছে। শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা এবং বেগম সুফিয়া কামাল এই ধারার কবি। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের ভিন্নতর এবং নতুনতর বৈশিষ্ট্য এই যে, এঁরা সকলেই তাঁদের নিজস্ব সমাজ পরিবেশের প্রতি মনোযোগী এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য উপাদান নিজ উৎস থেকেই সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য উল্লিখিত ধারার মনোভংগীগত পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি না করেই তাঁরা নিজস্ব পরিবেশের দিকে মনোযোগী হয়েছেন, এতেও কোন সন্দেহ নেই। এঁদের সমসাময়িক আলোচ্য কবিদের মধ্যে কেবলমাত্র আবদুল কাদিরই রবীন্দ্র-বলয়ের ক্রান্তিপারে এসে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের প্রচেষ্টার ফল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে বিস্তৃত আলোচনার একান্তই আবশ্যক। বর্তমান আলোচনা তার সূত্রপাত মাত্র, এর বেশী কিছু নয়।

॥ ৩ ॥

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭)

গোলাম মোস্তফার কাব্য-রচনাকালের ব্যাপ্তি উল্লিখিত কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সন্দেহ নেই। ১৯২০ সালের আগে থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত কবি হিসাবে তাঁর সক্রিয়তা অব্যাহত ছিল। তাঁর কাব্যবোধের অভাব নেই, ভাষায় স্বচ্ছতা রয়েছে এবং শব্দের ব্যবহার তাঁর কাছে দুরূহ কোন পরীক্ষা নয়। সুতরাং এই দীর্ঘকালের কাব্য সাধনায় গোলাম মোস্তফার নিজস্ব পরিণতি, কাব্য ভাবনা এবং কাব্যাদর্শের পরিচয় থাকবে, এটুটে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়। তাছাড়া একটা যুগচিহ্নের মধ্যে থেকেও আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রের মহিমা ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই একজন কবির কাব্য সিদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত রয়েছে বলে, গোলাম মোস্তফার সেই নিজস্বতার একটি সুস্পষ্ট আলেখ্যও এখন অবশ্যই আমরা করতে পারি।

কিন্তু এই বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমেই একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হল, গোলাম মোস্তফার কবিতা এত বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে যে, ফলে তাঁর মূল কবিপ্রকৃতির স্বরূপটাকে আলাদা করে নেওয়া কিছুটা দুষ্কর।

'রক্তরাগ' কাব্যগ্রন্থের 'ঈদ উৎসব', 'পরিচয়', 'বিজয় উল্লাস', 'স্বাধীন মিশর', 'হিন্দু মুসলমান', 'সত্যেন্দ্র স্মৃতি' প্রভৃতি, 'খোশরোজ' কাব্যগ্রন্থের 'মুসলিম', 'সবে বরাত', 'কোরবাণী', 'ইসলাম' এবং এই ধরণের অন্যান্য কবিতা, যেমন 'লীগবিজয়', 'আমানুল্লাহ', 'বাচ্চাসাক্কা', 'শিক্ষক' প্রভৃতি তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় এত বেশী যে, স্বাভাবিকভাবেই একথা মনে হতে পারে—গোলাম মোস্তফার মনে বুঝি চারণবৃত্তিই অধিকতর ভাবে ক্রিয়াশীল। মুসলিম জাগরণের অপরিহার্য আবশ্যকতা গোলাম মোস্তফার কবিমনকে এই ধরণের কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে, একথা অবশ্য সহজেই বোধগম্য। কিন্তু শুধু এই কবিতাগুলোই যে একজন কবির কাব্যসিদ্ধির জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়, এই সত্যও অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া উল্লিখিত কবিতাগুলোর কাব্য সাফল্যও প্রশ্নের ঊর্ধে নয়। এ সম্পর্কে পর্যালোচনার পূর্বে গোলাম মোস্তফার কাব্যশক্তি কোন পর্যায়ে যথার্থভাবে বিধৃত হয়েছে, তাই খুঁজে দেখা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

প্রেমানুভূতির কবিতাগুলোর মধ্যে গোলাম মোস্তফার কাব্যবোধ অনেকটা সচ্ছল। কবিমনের অন্তরঙ্গ অনুরণন, নিজের কথার চাঞ্চল্য সেখানে আভাষিত হয়ে উঠেছে। ফলে একটি কবি ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও সেখানে বিধৃত। 'হাস্নাহেনা' ও 'সাহারা' কাব্যগ্রন্থে এধরণের কবিতার সংখ্যা বেশী। এই কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ এর মধ্যে। আমার মনে হয়, গোলাম মোস্তফার কবিজীবনে এই দশ বছরই শ্রেষ্ঠ সময়। এই কাল পরিধিতে এক গভীরতর দুঃখে কবি যেন উদ্বুদ্ধ। এই দুঃখ তাঁর মনকে ভেতরের দিকে টেনে এনেছে। ফলে গোলাম মোস্তফার সহজাত বহির্মুখীন প্রবণতা এই সময়ে স্তিমিত হয়ে গেছে। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বোধের পরিচর্যায় অন্ততঃ এই দশ বছর ব্যস্ত থাকতে পেরেছেন।

এই সময়ের কবিতাগুলোতে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি, গোলাম মোস্তফা—তাঁর কাছে প্রেমের অর্থ কি, তাঁর রূপপিপাসার স্বরূপই বা কি প্রভৃতি অভিধার দিকে—দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। এবং তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যচেতনার মর্ম খুঁজতে নিজের অন্তমূলের গভীরেও তাকিয়েছেন। এই চেতনা শিল্পীর চেতনা, ফলে কয়েকটি শিল্পোত্তীর্ণ কবিতা গোলাম মোস্তফা এই সময়ে লিখতে সক্ষম হয়েছেন। 'হাস্নাহেনা', 'সন্ধ্যারাণী', 'প্রিয়তমা', 'পাষাণী', 'নিশীথ রাতের মুসাফির', 'তুমি ছিলে ফুল আর আমি বুলবুল',

'তোমারে যে আমি করেছি রূপসী', 'কবির প্রেম', 'শেষ ক্রন্দন', এই কবিতাগুলো এই সার্থকতার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যায়।

উল্লিখিত কবিতাসমূহের সব কয়টিই প্রেমানুভূতিকে কেন্দ্র করে লেখা। এমন কি 'হাস্নাহেনা' কবিতাটি যদিও প্রকৃতির আধারে সংস্থাপিত তবুও প্রেম-সম্পর্কিত ধারণাই এতে রূপকের আশ্রয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'সন্ধ্যারাণী' কবিতাটি সম্পর্কেও মূলগতভাবে একথা সত্য। প্রকৃতপক্ষে গোলাম মোস্তফার মনে প্রকৃতি তেমন বেশী সাড়া জাগাতে পারে নি। তাঁর কবিমন একটি মাত্র ক্ষেত্রে গভীরতর স্পর্শে জড়িত হয়েছে, সেটা হল ব্যক্তি প্রেম। গোলাম মোস্তফার এই প্রেমের অনুভবে ব্যক্তির উপস্থিতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট— এখানে কোন abstraction এর প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন নি, তাঁর মানসিকতাও তেমন নয়। এ-ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রেমিকা প্রতিমা সামনে রেখেই তাঁর মন উৎসারিত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎসরণের ক্ষেত্রে বিপদ এই যে, বাহ্যিক ঘটনার অনুপ্রবেশে এবং অনুভূতির পারম্পর্যমূলক তথ্যের প্রাধান্যে কবিতায় মূলতঃ প্রেমানুভূতির যে স্বাধিকার প্রমত্ত সঞ্চরণ ও প্রতিষ্ঠা মূর্ত হয়ে ওঠার কথা তাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাতে কবিতাটি যতখানি পদ্য হয় এবং নিজের আনুগত্যের সমর্থক ও বিশেষ বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের অনুকূল হয় বলে যতখানি কবিকে খুশী করে ততখানি কাব্য হয় না। গোলাম মোস্তফা এই বিপদে কম আক্রান্ত হন নি এবং ফলে তাঁর ব্যর্থ প্রেমের কবিতার সংখ্যাও অপ্রচুর নয়। এর জন্যে দায়ী তাঁর বহির্মুখী মন, দায়ী আত্যন্তিকভাবে বাস্তবতার আটপৌরে প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য। এই ধরণের ব্যর্থতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, 'পাশের বাড়ীর মেয়ে'। অতিরিক্ত তথ্য কেন্দ্রিকতা এই কবিতাকে অত্যধিক অকাব্যিক উপাদানে ভরে তুলেছে এবং অন্যপক্ষে কবির বহির্মুখীন স্বভাব তাঁর কাব্য উপলব্ধির স্বরূপ বোঝার বেলাতেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বহির্মুখীনতা তাঁর নিজস্ব কাব্য উপলব্ধির স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে এমনি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে 'ভূষণ' এবং 'কুড়ানো মানিক' কবিতাদুটোর বেলাতেও। 'কুড়ানো মানিক' সৌন্দর্যপ্রিয়তার সার্থক একটি নিদর্শন হতে পারত। সুন্দর পরিবেশে সুন্দর মুহূর্তে সুন্দর ছোট্ট একটি মেয়েকে ভালো লাগার যাথার্থ্য নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। ভালো-লাগা সুন্দর ছোট্ট মেয়েটাকে আলগোছে ছোট্ট করে ছুঁয়ে দেওয়াটাও ফুলের মতই সুন্দর হয়ে ফুটে উঠতে পারত। নিঃসন্দেহে এ কবিতার বিষয়বস্তু। কিন্তু কবি তাঁর নির্বাচিত বিষয়ের

গভীরতর তাৎপর্যটা উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং শেষপর্যন্ত মানস উদ্বোধনের বিশুদ্ধতাও অক্ষুণ্ণ থাকে নি। সৌন্দর্যানুভূতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে অন্য অনুভূতি এবং কবিও বিভ্রান্ত হয়ে সাড়া দিয়ে উঠেছেন। 'শিহরিয়া উঠিলাম ঘন পুলকে' একথারই সাক্ষ্য দেয়। এই পুলক যে যৌবন-আক্রান্ত পুলক এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং অন্যপক্ষে কবি যে অন্ততঃ এই কবিতাতে ভালো লাগার উপলব্ধিতেই মূলতঃ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এতেও কোন সন্দেহ নেই।

তবে পরিণতিতে এই বিভ্রান্তিটা এল কেন? তার কারণটা হল সেই বহির্মুখীনতা। বহিরঙ্গ জীবনের বিচিত্র আকর্ষণ গোলাম মোস্তফাকে প্রায় সব সময়ই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই আকর্ষণের ধারাবাহিকতায় সবসময়ে সাড়া দেওয়ার প্রবণতা থাকার দরুণ এই আচ্ছন্নতা তার স্বভাবে মিশে গেছে, অভ্যাসে এক হয়ে গেছে! সেজন্যে নিজের ভেতরটাকে তলিয়ে দেখার, নিজের অন্তরঙ্গ বোধকে গুছিয়ে নেওয়ার, নিজের সৌন্দর্য, উপমা ও শব্দচেতনাকে মার্জিত করার, শিল্পবোধকে অব্যাহত ও ধারাবাহিক করার, বিশেষ করে, অভিজ্ঞতার উপাদান সমূহকে শিল্প উপাদানে সংশোধিত করার উপযোগী অবকাশ তাঁর মিলেছে কম। এমন কি এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগও বুঝি তাঁর ঘটে নি। এই কারণেই যে যৌবনানুভূতির ক্ষেত্রেও মার্জিত হওয়ার প্রেরণা তিনি পান নি তা সহজেই অনুমান করা যায়। কবির অভিজ্ঞতা তো পরিশীলিত অভিজ্ঞতা—তা গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, তাকে পরিশীলিত হতেই হবে। এর অভাব রসবোধকে ক্ষুণ্ণ করে, কবিতাকে বিপন্ন করে। কিন্তু এর অভাব যদি বিকৃতিকেও প্রশ্রয় দেয় তবে তা রসবোধ আর কাব্যের গণ্ডী এড়িয়ে সাধারণের রুচিকেও বিব্রত করে ফেলে। তাই কবিকে কোবিদ হওয়া প্রয়োজন—সতর্ক সজ্ঞান রুচিসজাগ ও পরিশীলিত না হলে তাঁর বুঝি চলে না!

অথচ গোলাম মোস্তফার কবিমন ছিল, শিল্পদৃষ্টি ছিল এবং বলবার কথারও তাঁর অভাব ছিল না। এ কথার সমর্থনে আমি আগেই তাঁব কয়েকটি সার্থক কবিতার বিষয় উল্লেখ করেছি এবং সেগুলোতে গোলাম মোস্তফার কবিপ্রকৃতির স্বরূপ বিধৃত রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছি। এই কবিতাগুলোতে গোলাম মোস্তফার মনের সম্প্রসারণ ঘটেছে, সার্থক কবিতার জন্যে এর প্রয়োজন একেবারেই প্রাথমিক। গোলাম মোস্তফার ভাব ও ভাষা তাঁর অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রে

বিষয়বস্তুর বড় অনুগত, বাধ্য। এই বাধ্যতার দরুণ কোন প্রকার সংকটও সেক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়, তিনি যেন বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ করার দায়িত্বেই নিজকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছেন নির্দ্বন্দ্বভাবে। এ গুণ ভালো গদ্যের, কাব্যের নয়। কাব্যে অবশ্যই আমরা শব্দের দ্যোতনা চাই, ভাব তার ব্যবহারিকতা ও উদ্দেশ্য-প্রবণতাকে ছাড়িয়ে আভাষে ব্যাপ্ত হবে—এও কাব্যের অপরিহার্য আবশ্যকতা। কবিতায় ভাব ভাষাকে ছাড়িয়ে উঠবে, ভাষা ভাবকে ছাড়িয়ে উঠবে। ফলে কবিতায় ঘটবে স্বাধিকার সচ্ছল এক কবিমনের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ। কবির মনের পরিচয়ই তো প্রকৃত কাব্য। সেজন্যেই এক কবি আর একজন থেকে আলাদা—একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে উদ্বুদ্ধ হলেও কত আলাদা!

গোলাম মোস্তফার কবিমনের এই স্বাভাবিক সঞ্চরণ, তাঁর নিজের কথার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে এদের সকলেরই আধার দ্যোতনাময় শব্দের পরিচয় উল্লিখিত সার্থক কবিতাগুলোর মধ্যে কিছুটা পাওয়া যায়। এতে তাঁর মনের সৌন্দর্যস্বরূপ সম্পর্কেও কিছুটা জানার সুবিধে রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে 'প্রিয়তমা' কবিতাটি নেওয়া যাক।

কবিতাটি একটি কাব্যিক সত্যভাষণের বলিষ্ঠতায় উদ্দীপ্ত। এতে ব্যক্তির প্রেমের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েও এবং প্রেমের আন্তরিকতার পরিচয় অন্তরঙ্গ সুরে ফুটিয়ে তুলেও কবি বলছেন:

হায় প্রিয়া! কবি-চিত্ত একা কারো নয়!
কবি আমি, চিরদিন রূপের পিয়াসী,
এ বিশ্বের যত রূপ—সবারেই আমি ভালবাসি।
এই পথে দাঁড়াইয়া নিখিলের পানে যবে চাই,
মনে হয়—আমি মুক্ত—
মোর তরে কোন ধর্ম—কোন নীতি নাই।
সৌন্দর্য্যের পথ বাহি' দিকে দিকে যবে দলে দলে
নিখিলের নর-নারী আসে মোর অন্তরের তরু-ছায়া-তলে,
কারা হিন্দু, কারা বৌদ্ধ, কারা জৈন, কারা মুসলমান,
কারা যে ইহুদী আর কারা শূদ্র সাঁওতাল খৃষ্টান—
একথা পড়ে না মনে,
গোপনে গোপনে

হৃদয় ছুটিয়া যায়, এ উহারে করে কোলাকুলি,
বিধি নিষেধের বাণী মানে নাকো—সব যায় ভুলি।
সেই কবি—তুমি তারি প্রিয়া,
তাহারে রাখিবে ধরে বল সখি, কী বন্ধন দিয়া ?

এবং,

তুমি মোর আঁখি-কোণে যতটুকু জ্বালো রূপ-আলো,
ততটুকু প্রিয় তুমি—তুমি মোর আলো।

কিছুটা বক্তব্য ও বাচনভংগীর শিথিলতা থাকা সত্ত্বেও গোলাম মোস্তফার এই কবিতা একটি সার্থক ব্যতিক্রম। তাঁর অন্যান্য প্রেমমূলক কবিতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রেমের প্রতি ঐকান্তিকতার পরিচয় দেওয়ার জন্যে যে উদ্ভট 'প্রমাণ' তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা তো এতে নেই-ই বরং কবি-মনের মুক্তি এতে ঘটেছে। এই মুক্তি ব্যভিচারের সমার্থক নয়—নিছক সৌন্দর্য পিপাসারই দ্যোতনা। তাই এতে গোলাম মোস্তফার সৌন্দর্যধারণারও একটা পরিচয়, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হলেও, ফুটে আছে।

'পাষাণী' কবিতাটি নির্দিষ্ট ঘটনাকেন্দ্রিক, মৃত প্রিয়াকে লক্ষ্য করে লেখা। কবিতার বিভিন্ন স্তরে তা স্পষ্ট। কিন্তু এই ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে সার্বজনীন করে তুলতে গোলাম মোস্তফা এই কবিতায় সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বিষণ্ণ করুণ অন্তরঙ্গ বোধ সর্বজনের দুঃখের সঙ্গে, বাস্তবতার অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে, নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে এক হয়েছে এবং তিনি তা নিয়তির মত প্রকৃতির অস্তিত্বের ব্যাপক তাৎপর্যের মধ্যে সংস্থাপিত করতে পেরেছেন।

আকাশ সেদিন
অজানা কী বেদনায় পাণ্ডুর মলিন।
সজল কাজল মেঘ কোথা হতে নীরবে আসিয়া
নীরবেই যেতেছিল কোন্ দূরে ভাসিয়া ভাসিয়া।
সেদিন চাঁদের আলো প্রভাহীন, ছিল না মাধুরী,
বিষাদের বেশ-পরা যেন কোন্ রূপসী আতুরী
বসেছিল নতমুখে; ম্লান আঁখি মেলি
বারে বারে চে'তে ছিল ঘন-মেঘ আবরণ ঠেলি'।

ভরা বরষায়
অদূরে গড়াই নদী কলতানে মর্মর ভাষায়
বিবাহের গান গেয়ে ব্যথিত পরাণে
যেতেছিল সাগর-প্রয়াণে।
বিশ্ব চরাচর
নীরবে দাঁড়ায়েছিল বেদনা-কাতর
একখানি বিষাদের ছবির মতন।...

'পাষাণী' ও 'প্রিয়তম' কবিতা দুটোর বক্তব্য বিপরীত। কিন্তু কবিমনের সেই সত্য-উন্মুখ ভেতরের তীব্রতা এ দুটো কবিতাকেই প্রকৃত কাব্যে পরিণত করেছে। 'নিশীথ রাতের স্বপ্ন' ও 'তুমি ছিলে ফুল আর আমি বুলবুল' কবিতা দুটোও একটি ভাবের দুই বিপরীত কেন্দ্র। এ দুটো কবিতা হিসেবে উতরিয়েছে এবং আলোচ্য চারটি কবিতা এবং অন্য একটি কবিতা 'তোমারে আমি করেছি রূপসী' মিলে একটি ধারণার বৃত্ত রচনা করেছে যেখানে গোলাম মোস্তফার একটি সহমর্মী মনের পরিচয় আছে, নিজের শক্তিমন্ত মনের প্রেমে উদ্দাত্ত হয়ে জ্বলবার ক্ষমতা আছে এবং সর্বোপরি নিজেকে ছাড়িয়েও জীবনের ব্যপকতায় নিজ অস্তিত্বের সমর্থক উৎসকে উপলব্ধি করার জন্য উন্মুখ বোধের পরিচয়ও ফুটে আছে।

কিন্তু এ পথে কি গোলাম মোস্তফা পরিণতি খুঁজেছেন? বোধ করি না। আর তাছাড়া এই ধরণের সার্থক কবিতার সংখ্যাও তাঁর রচনায় এত কম যে, এই মুষ্টিমেয় কবিতার ওপর তাঁর কবিপ্রতিষ্ঠা নির্ভর করে আছে, ভাবতেও সংকোচ বোধহয়। আর স্বাভাবিকভাবেই এই তথ্য অবিসম্বাদিতভাবে সত্য হলে তাঁর প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নানা চিন্তায় মন দুলে ওঠে।

গোলাম মোস্তফার প্রধান ত্রুটি এই যে, তিনি 'বড় বেশী নির্ধারিত' বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছেন—এমন কি কাব্যোপযোগী বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট নির্ধারিত উৎসকেও তিনি বারবার অসম্ভব আনুগত্যে প্রকটভাবে সামনে টেনে এনেছেন। এতে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠামোগত বক্তব্যেই ভার হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা—প্রেরণা অন্তরঙ্গ বোধে রূপান্তরিত হতে পারে নি। ফলে কাব্যাদর্শের পরিপূর্ণ উদ্বোধন ঘটেনি এবং এর ধারাবাহিকতাও অব্যাহত থাকে নি তাঁর কাব্যে।

বাইরের বিষয় তাঁকে এত অল্প আয়াসে আকর্ষণ করেছে এবং বর্তমানের তাৎক্ষণিক মূল্য তাঁকে এত বেশী প্রলুব্ধ করেছে যে সাম্প্রতিকতার মোটা বোলে বেজে ওঠা তাঁর কাছে বড় বেশী মোহনীয়, মূল্যবান মনে হয়েছে—সে সবের সারাৎসারের দিকেও তাকান নি, নিজের ভেতরের দিকেও নয়। বাইরের উচ্চকিত জৌলুষপূর্ণ ঘটনার আলোড়ন তাঁর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নিয়েই তাঁর কাছে অক্ষুণ্ণ থেকেছে—এর চারণবৃত্তিতে কতখানি উচ্চকণ্ঠ হতে পারেন তিনি, তারই সাধনা যেন তাঁকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছে, ব্যাপৃত রেখেছে। এজন্যে তাঁর অনেক বক্তব্যই অপ্রোথিত থেকে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে ভাষাও রয়ে গেছে নিতান্ত স্থূল শিথিলরূপে। বহির্বিষয় তাঁর মনকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। অথচ এই দ্বৈত দোলায় দুলে তিনি সংকটেও ভোগেন নি— বাহিরই জয়ী হয়েছে তাঁকে আচ্ছন্ন করে। নজরুলও set বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর আবেগ ও বক্তব্য অবিমিশ্র হয়ে গেছে— সেখানে সেই বিষয়কে ঘিরে তাঁর আত্মার উদ্বোধন ঘটেছে, এক অনিবার্য সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তাঁর স্বর। বিষয়বস্তুর বহিরঙ্গতাকে ছাপিয়ে উঠেছে অন্তরের রস— তাতে কবিতার স্বাদ ফলে উঠেছে। গোলাম মোস্তফার কাব্যে সাধারণভাবে আবেগের এই অনিবার্যতার অভাব রয়েছে, বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতার অভাব রয়েছে। অথচ প্রত্যেক কবিতার বেলাতেই সেই বিষয়বস্তু কবির নিজস্ব হয়ে ওঠা দরকার— কাব্যের সাফল্যের জন্যে এ একেবারেই অপরিহার্য। এমন কি ধর্মসংক্রান্ত বা অতীত-সম্পর্কিত কবিতার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম অচল।

বিশেষ করে ধর্ম ও অতীত সংক্রান্ত কবিতায় গোলাম মোস্তফার উপরোক্ত দুর্বলতা প্রকটতর। এ ধরণের কবিতায় দেশ, জাতি ও কাল এক নতুন তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গোলাম মোস্তফার বেলায় প্রায়ই তা ঘটে নি। বরং এ ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত আবেদন, উদ্দীপনা, আশা ও আস্থার স্থলে অতীতের বা ধর্মের মোহান্ধ প্রচার প্রধান হয়ে উঠেছে, আঙ্গিক হয়ে উঠেছে ছকে ফেলা ছন্দোবন্ধ নিবন্ধের। 'হিন্দু-মুসলিম' পদ্যটি এর একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ। 'ভবিষ্যতের স্বপ্ন' কবিতাটি fanatic, — স্বাধিকারের প্রশ্ন ছাড়িয়ে অন্যের সঙ্গে বিরোধের মনোভাব সেখানে আধিপত্য লাভ করেছে। সামগ্রিকভাবে গোলাম মোস্তফার এই জাতের কবিতাগুলোতে নবজাগরণের কাব্যিক আশা-চঞ্চলতা

কিংবা আস্থা কোন অনুরণন লাভ করে নি, বরং নীতিকথন বা ধর্ম- ও অতীত-কেন্দ্রিক উচ্ছল গর্ববোধই মুখ উঁচিয়ে আছে। তা যতখানি অতীত ততখানি বর্তমানের প্রেক্ষিতে সঞ্জীবিত নয়, যেমন নজরুলের কোন কোন ধর্ম-ঐতিহ্য-নির্ভর কবিতার বেলায় ঘটেছে। গোলাম মোস্তফা তাঁর এই দৈন্য ঢাকতে চেষ্টা করেছেন অতিশয়োক্তি এবং তথাকথিত কল্পনাবিলাসের ফেনিলতা দিয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কতটুকু?

কিন্তু এই পর্যায়ে গোলাম মোস্তফার 'মানুষ' কবিতাটি আশ্চর্যভাবে উত্‌রে গেছে। যদিও ধর্মপ্রেরণা থেকে কবি এটা লিখেছেন, তবুও এটার গোত্র আলাদা। মানুষের গুরুত্বের উপলব্ধিই এখানে মহত্তর মহিমায় এর পটভূমিকে ছাপিয়ে উঠেছে এবং যথাযথ নাটকীয় ব্যঞ্জনায় মানব-মহিমার প্রতিষ্ঠাকে তিনি এই কবিতায় স্থাপিত করতে পেরেছেন। ব্যাপকতর পরিসরে একই বিষয়ের ওপর লেখা 'বনি আদম' কাব্য-খণ্ডটি কিন্তু এই সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি। তার প্রথম কারণ বোধকরি এই যে, যে সংহত সংযত আঙ্গিক ও ভাষাবিন্যাস এবং মূল বক্তব্যের শৌর্য যে বিদ্যুৎদীপ্ত সংক্ষিপ্ততায় 'মানুষ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে তার প্রত্যেকটিরই অভাব রয়েছে 'বনি আদমে' —বরং এ যেন এলিয়ে গেছে দীর্ঘায়ত হওয়ার প্রবণতায়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, উদ্দীপ্ত মানব-বিশ্বাস 'মানুষ' কবিতাটির মূল শক্তি ও সৌন্দর্য— কিন্তু 'বনি আদমে' সেস্থলে প্রথাবদ্ধ চাঞ্চল্যহীন নিরক্ত ভক্তিস্রোতই সব কিছুকেই ছাপিয়ে অঢেল হয়ে উঠেছে।

বিষয়মূল্যের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে অচেতনা এবং নিজস্ব মূল্যবোধের নিশ্চিততার অভাব এই ধরণের কাব্যিক বিভ্রান্তির কারণ। কিন্তু 'মানুষ' কবিতাটিতে গোলাম মোস্তফার রূপায়ণ-প্রতিভা এবং কাব্য-পরিকল্পনা সার্থক, এতে কোন সন্দেহ নেই। এতে তাঁর কবিস্বভাব শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ থেকেছে। কিন্তু এই ধরণের কবিতার বেলায় গোলাম মোস্তফার ক্ষেত্রে এমন পূর্বাপর আত্মস্থতা এবং চারণ স্বভাবকে বর্জন করা এমনই এক বিরল ঘটনা যে, 'মানুষ' কবিতাটির সাফল্য একটি ব্যতিক্রম বলে মনে হয়! গোলাম মোস্তফা কিছু ধর্মানুভূতিমূলক কবিতা লিখেছেন নজরুলের কবিতাকে সামনে রেখে। মনোভংগীর জন্যই সেগুলোর গোত্র নজরুল থেকে আলাদা। এবং এ ক্ষেত্রে

তাঁর সফল কবিতা আছে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ 'মানুষ' কবিতাটি গোলাম মোস্তফার ধর্মানুভূতিমূলক কবিতার সার্থকতার নিজস্ব পথের নির্দেশ ফুটিয়ে তুলেছিল। কিন্তু গোলাম মোস্তফা এ পথেও ধারাবাহিক পদক্ষেপে অগ্রসর হন নি।

তাঁর আর কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে, যেমন উঁচু ভাব বিস্তার করতে গিয়ে খেই হারিয়ে মামুলী কথায় পর্যবসিত হওয়া, মিলের দৃষ্টিকটু অসামঞ্জস্য, বাস্তবতা ফুটাতে গিয়ে নিতান্ত অকাব্যিক চিত্রের প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এই নিয়ে কি বেশী আলোচনার প্রয়োজন আছে?

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৪—১৯৫৩)

শাহাদাৎ হোসেনের প্রকৃতি পল্লীপ্রকৃতি নয়, নদী নালা আকাশ মাটি আর গাছপালা-সমাচ্ছন্ন দৃশ্যের অনন্ত রাজ্যও তা নয়। শাহাদাৎ হোসেনের প্রকৃতি তাঁর বৈদগ্ধ্যের উপলখণ্ড, তাঁর চেতনার পল্লবিত শ্যামলিমা। যদি প্রশ্ন এই হয় যে, শাহাদাৎ হোসেনের কবিতার বিষয়বস্তু কি? তাহলে উত্তর এই যে, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হল, দৃশ্যের সম্ভারে জাগ্রত স্বপ্ন। স্বপ্নের মধ্যেই তাঁর সকল উপলব্ধি সত্য হয়ে উঠেছে, তাঁর সকল অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র স্পন্দন লাভ করেছে। স্বপ্ন তাঁর কাছে সত্য, সত্য তাঁর কাছে স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন ও সত্যের নিগূঢ় বন্ধনে প্রকৃতির আধারে জীবনের সব কিছুই জায়গা পেয়েছে: দুঃখ, কান্না, ভোগ, প্রতীক্ষা, হতাশা, প্রেম, বিতৃষ্ণা এবং মোহ এবং অবসান।

আর স্বপ্নে যেমন সবাই একা, শাহাদাৎ হোসেনের এই উৎসরণেও তিনি একা স্বতন্ত্র, ভিন্ন এবং একান্ত। এর সার্বজনীনতা শুধু এইখানে যে, এ অন্যের অনুভূতিকে আহ্বান করে এবং যে তাঁর স্বপ্নে একাত্ম হতে পারে তার কাছে এই অনুভবের জগতও হয়ে ওঠে অর্থময় স্পন্দনময়!

আর যদি এই প্রশ্ন ওঠে শাহাদাৎ হোসেনের মনোভংগী কি, মনের বৈশিষ্ট্য কি? তবে এক কথায় তার উত্তর: শাহাদাৎ হোসেন সৌন্দর্যবাদী। এই সৌন্দর্যবাদে যতটুকু জীবনের প্রশ্রয় ঘটতে পারে ততটুকুই জীবনবাদী তিনি, যতটুকু বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রধান হয়ে উঠতে পারে ততটুকুই বিচ্ছিন্নতাবাদীও

তিনি। সে কারণে তাঁর পরিপার্শ্বের প্রতি তাঁর কোন দায় ছিল না। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর পরিপার্শ্বকে তিনি পরিহার করেছেন কিংবা পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অনীহাযুক্ত বা অসচেতন তিনি ছিলেন। বরং পরিপার্শ্ব তাঁর নিজকে ব্যক্ত করার উপাদান হিসেবেই কার্যকরী হয়েছে। মূল কথা এই যে, তিনি পরিপার্শ্বের তাগিদে উদ্বুদ্ধ হন নি, নিজের তাগিদেই পরিপার্শ্বকে আত্মস্থ করেছেন, নিয়োজিত করেছেন, ব্যবহার করেছেন।

এই ধরণের মানসিকতাকে আত্মকেন্দ্রিক বলা চলে; কিন্তু একে আত্মসর্বস্ব বলা যায় কিনা, তাই নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। লক্ষণীয় যে, শুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা বাংলা কবিতার একটি নবাবিষ্কৃত মূল্যবোধ। এর উৎস যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু এর ব্যাপকতর পরিচর্চা হয়েছে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকেই। অবশ্য এর নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই পরিস্থিতিতে সৌন্দর্যচেতনা অনেক কবির বেলাতেই আদর্শচেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কাব্যে সৌন্দর্যচেতনার প্রতিষ্ঠাকে জীবনের মূল্যপ্রতিষ্ঠার অন্যতম পন্থা বলে মনে করতে পেরেছিলেন। তাঁরা ছিলেন নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, শিল্পের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ! এই উদ্যমে আত্মকেন্দ্রিকতা অপরিহার্য ছিল, কেননা আত্মাই এই প্রচেষ্টার অবধারিত উপাদান। এ এক আর্দশায়িত বিষয়। সুতরাং আত্মসর্বস্বতার প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

শাহাদাৎ হোসেনের নিকট তাঁর শিল্পীসত্তার এই স্বরূপটি সুস্পষ্ট ছিল—কবিতাকে তিনি শিল্প ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারেন নি। স্বপ্নের কল্প-জগতে সৌন্দর্যকে তথা শিল্পাদর্শকেই তিনি অন্বেষণ করে ফিরেছেন। সে কারণে জীবনের সঙ্গে বিরোধের প্রশ্নও তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি, সাম্প্রতিকতার দোলায় দুলে ওঠেন নি বলে তাঁর মনে সংকটেরও সঞ্চার হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জীবন ও নিছক শিল্পের কোথায় নির্দ্বন্দ্ব মিলন হতে পারে সেই উৎসটির পরিচয় শাহাদাৎ হোসেন, ব্যাপকভাবে না হলেও, জেনেছিলেন, নিজের মত করে তা সংক্ষিপ্তভাবে হলেও, পেয়েছিলেনও! এতেই তাঁর নিঃশঙ্ক তৃপ্তি ছিল এবং সেজন্যেই নিজের পরিমণ্ডলের বাইরে পা-ও বাড়াতে তিনি চান নি সহজে। এই মানসিকতা শাহাদাৎ হোসেনের এতই মজ্জাগত যে, এমন কি, অতীত বা ধর্ম সংক্রান্ত বা জাতীয়তাবোধক কবিতাগুলোতেও তিনি তথ্য ও প্রচারিত নীতির অনুগত না

হয়ে নিজস্ব ভাবনা ও শব্দকল্পলোকে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং নিজের প্রাণের অনুকূল বক্তব্যের স্পর্শের জন্যে আকুল হয়ে উঠেছেন। এখানেও তাঁর শিল্পীসত্তার অন্বেষা অটুট। অতীত বা ধর্মসংক্রান্ত কবিতার এই বৈশিষ্ট্যে তিনি তাঁর সমসাময়িক মুসলিম কবিদের থেকে একেবারেই আলাদা—বোধ করি সমগ্র বাংলা কবিতাতেও এ-ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতা স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে।

কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

সহসা সে কার বোধনবীণায় বাজিল চিরন্তনী,
স্তম্ভিত দিশি বিপুল মন্দ্রে সহসা উঠিল রণি ;
নিখিল মর্ম-কেন্দ্রে ধ্বনিল "আল্লাহো-আকবার।"
মরু-ধরনীর ঊষর উরস শিহরিল বার বার।
সহসা সুদূর বালুকা-বেলায় দিগন্তরের পারে
ফেরদৌসের 'নহর' নামিল লক্ষ নিঝর-ধারে।
রুদ্র রবির দহন থামিল— মরণের তাণ্ডব,
মহাগীতরাগে লীন হোয়ে গেল ধ্বংসের কলরব।
মৃত্যু নটিনী সাইমুম রথে মূর্চ্ছিত মহাকাল
দুর্জয় গতি হারাইয়া লুটে দুর্জয় কঙ্কাল।
দূর-দিগন্তে মরীচি মোহিনী হারাইল মায়াবল,
মরণের 'দহে' ফুটিয়া উঠল জীবনের শতদল।
বহ্নি বাহিনী ধরণী ভরিল অমৃত রসধারে,
ধ্বংস রূপিনী শতদলে ফুটে সৃষ্টির পারাবারে।
—(মরু সঞ্জীবনী)

সহজেই লক্ষ্য করা যায় উপরোক্ত স্তবকে কবি কেবলমাত্র প্রথাবদ্ধ তথ্যের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এর প্রায় প্রতিটি শব্দই সঞ্চরণ-উন্মুখ উৎকণ্ঠায় ভরে আছে। প্রায় প্রতিটি শব্দই যেন রূপকের ছটায় বৃহত্তর ব্যাপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার জন্যে উদ্‌গ্রীব। বস্তুতঃ শাহাদাৎ হোসেন তাঁর স্বভাবজ সৌন্দর্য-অনুভবের পাদপীঠ রচনা করেই তাঁর বক্তব্যকে এতে সংস্থাপিত করেছেন। শব্দের জন্যে তৃষ্ণা, মনোগত চিত্রের আভাষকে মনোমত রেখায় ফুটিয়ে তোলার আর্তির তীব্রতা আর প্রয়োগ কৌশলের উপভোগ তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে একাধারে এই স্তবকে এক হয়েছে। যেন এ এক ধ্যানস্থ ছবি। আর তাঁর

ধর্ম ও ঐতিহ্য বিশ্বাস এই ধ্যানের বাইরের কিছু নয়—তাঁর সৌন্দর্যপিপাসারই একান্ত অঙ্গ।

এমন কি তাঁর জাতীয়তাবোধক কবিতাও এই বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যতিক্রম নয়।

আরবী-দরিয়া বহিয়া এনেছে আরবের মরুবালি
কণিকা-কণায় মিশে আছে যার আজাদীর খুনলালী।
আখেরী নবীর কদম-পাকের ধূলির নিছনি লোয়ে
সাত শহীদের কোরবানী-রাঙ্গা মীনার স্মরণী বোয়ে
তুঙ্গ তুফানে অতলোত্তাল শতেক যোজন বাহি'
প্রাচী'র বেলায় গড়িল নবীন অপরূপ নওশাহী।
চকিত চমকে বিশ্ব নেহারে—এ কোন্ পাকিস্তান।
মন্দ্র গরজে ধ্বনিল সিন্ধু—আজাদ পাকিস্তান।

০ ০ ০

নব শাহানামা ফের্দ্দুসী রচে— মসনবী রচে রুমী,
খাইয়াম জাগে নব রুবাআতে সাকীর পেয়ালা চুমি'।
সাদীর সাধনা, হাফেজের ধ্যান নবযুগ রূপায়ণ
ইকবাল-হালী-গালেবের মাঝে লোভেছে চিরন্তন।

—(হে পাক পাকিস্তান)

কবির নিখিল মুসলিম জাতীয়তাবোধ যা উদ্ধৃত অংশে প্রতিফলিত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক যেমন অবান্তর, তেমনি তাঁর ধারণার বাস্তবতা ও যাথার্থ্য নিয়ে জিজ্ঞাসার সূত্রপাতও বোধকরি অহেতুক। তাছাড়া কবির এই ব্যক্তিগত ধারণার সঙ্গে কাব্যের যোগও নেই। এ ক্ষেত্রে আমার মূল বিচার্য বিষয় এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মত একটি জ্বলন্ত ঘটনাও শাহাদাৎ হোসেনের মনে কি ভাবে রূপায়ণ লাভ করেছে? লক্ষণীয় যে, সমস্ত পরিস্থিতিটাই তাঁর নিজস্ব স্বপ্নের মধ্যে পুনর্জাগরিত। একটি জাতীর ভবিষ্যতের স্বপ্ন, একটি জাতির সুন্দর বিকাশের সৌন্দর্য-নির্ভর আশায় এখানে তিনি উদ্বুদ্ধ। এমন সম্ভাব্য সুন্দরের আশ্বাসে তাঁর মন উচ্চকিত না হলে তিনি হয়তো এই বিষয়বস্তুর জন্যে আকর্ষণও বোধ করতেন না। তাঁর মৌলিক প্রবৃত্তিই তাঁকে এই নাটকীয় সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ বাস্তবতার দিকে আকৃষ্ট করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই একথা বলা চলে যে, শাহাদাৎ

হোসেনের মনই সর্বক্ষেত্রে তাঁর কাব্যের একমাত্র নিয়ামক শক্তি। তিনি অনুগত কেবল এই মনের কাছেই। আর এই মনের বিশিষ্টতাও এমন যে, এ নিজের পরিমণ্ডলের স্বরূপ সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন, নিজের পরিচিত পরিধির সঙ্গে বড় বেশী একাত্ম, আত্মস্থ, সংলগ্ন। নিজস্ব রুচিতে অনড়, নিজের ভালো লাগার সীমার বাইরে পা বাড়াতে একান্তই নারাজ।

তাঁর এই পরিচয় এই সকল উদ্ধৃত বহিরঙ্গ উপাদানমূলক দৃষ্টান্তসমূহের চাইতে তাঁর অন্তরঙ্গ উৎসরণের ক্ষেত্রে, নিজের স্বাভাবিক বিষয়ের রূপায়ণের ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশী স্পষ্ট, সহজ।

'বাণী চিরন্তনী' কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

বর্ষ-মাস-যুগ চলে—কাল বোয়ে যায়
লক্ষ কোটি কল্প আয়ু কল্পান্তে মিলায় ;
তবু সে আদিম বাণী সেই স্বপ্ন রহস্যের মায়ামন্ত্ররাগে
চিরন্তন অনাহত জাগে
নিখিলের অন্তহীন শূন্য বায়ুস্তরে।

আবার 'অবতরণিকা' কবিতার শেষ পংক্তিগুলোতে তাঁর উক্তি হলো ঃ

আজো কবি ফেরে নাই কল্পলোক-বাসে
ধরণীর বনকুঞ্জে আনন্দপ্রবাসে
আজো যে রয়েছে বসি শ্যামল মায়ায়
রূপচ্ছবি আঁকিতেছে কল্পতুলিকায়।
আগমনী প্রভাতের পরিপূর্ণ ছন্দোমহিমায়
দিগন্তের চিত্র-নীলিমায়
আজো তাই গেয়ে ওঠে অনামিকা নগ্ন সাগরিকা
সেই গান—অবতরণিকা।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় শাহাদাৎ হোসেন কাব্যে চিরন্তনে বিশ্বাসী এবং এ বিষয়ে তিনি খুবই সচেতন। আর চিরন্তন যে কেবল মাত্র সৌন্দর্যের মধ্যেই বিধৃত হতে পারে এতেও তাঁর কোন সন্দেহ নেই। এই চিরন্তন সৌন্দর্যকে তিনি অন্ত ও অনন্তকালের, লোক ও লোকোত্তরের, বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতের পটে রেখে দেখেছেন। তিনি বিকম্পমান সৌন্দর্যপ্রবাহের গ্রন্থিমালায় নিজেকে

কল্পলোকের অন্যতর গ্রন্থিতে প্রবেশের পূর্বে মর্তধামের প্রবাসী রূপমগ্ন কবি হিসেবে জানেন। তাঁর এই প্রবাস 'আনন্দ প্রবাস'। কেননা এও তিনি জানেন যে, সৌন্দর্যের পর্যায় পরিক্রমণ শুধুমাত্র আনন্দের মধ্যেই সম্ভব। শাহাদাৎ হোসেনের এই সৌন্দর্যচেতনা যে ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিক ঐতিহ্য থেকেই প্রেরণা পেয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। এবং এ ধারণা যে ত'ার বিশ্বাসে, মনে প্রাণে সংস্থিত হয়েছিল এতেও কোন সন্দেহ নেই। সে কারণে তিনি সর্বত্রই মহত্তম অনুভূতির উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন এবং অনুভব করতে চেয়েছেন সবকিছুই পরিশীলিতভাবে। তাই ত'ার উল্লাস হল আনন্দ, দুঃখ হল দুঃখের নির্যাস আর হতাশা হল কালের বন্ধনে বাঁধা মানুষের অতিক্রমণ-পিপাসু আর্তধ্বনির প্রতীক। ফলে ব্যক্তির চেয়ে বোধ ত'ার কাছে বড় এবং যা কিছু ক্ষয়কে ছাড়িয়ে অক্ষয়ে পর্যবসিত সেসবের দিকেই তাঁর ঝোঁক, তাই তাঁর উপজীব্য।

এই জন্যেই প্রিয়াকেও এমনি করে দেখতে পেলে তবেই তাঁর যন্ত্রণাবদ্ধ আবেগ মুক্তি পায়ঃ

> সারা প্রাণ ছেয়ে গেল অরুণার অরুণিম রাগে
> রঙীন স্বপনে জাগা ঢুলুঢুলু আত্মা মোর কি যেন কি মাগে।
> অকস্মাৎ তুমি দিলে দেখা,—
> নন্দন-তোরণে মোর অপরূপ গতিচ্ছন্দে চারু চিত্রলেখা;

আর হতাশা, তাও কি শুধু ব্যক্তিমনের সীমিত আলোড়নে ক্ষোভ জানিয়েই শেষ?

> নিদারুণ অপমানে অভিমানী সে আমার গুমরিয়া কাঁদে,
> তাই কাঁদি আমি, অনুতাপে কাঁদি— রাক্ষসীর ছলনার ফাঁদে
> কি কুক্ষণে পড়েছিনু হায়! দেবতায় অপমান করি
> যুগের তপস্যা মোর ডাকিনীর পদতলে রাখিলাম ধরি।
> উৎকট আনন্দে মাতি' জীবনের তীরে,
> ছিন্নমস্তাসম মিটাইনু তৃষ্ণা মোর আপন রুধিরে।...
> উপেক্ষার হাসি ছাড়া কি আমারে দিবি তুই দান?
> থাক পড়ি বিত্তের দুয়ারে, আমি হেথা দীনহীন
> পোড়ে আছি উপেক্ষিত—রব চিরদিন।
> তারপর অশ্রুর সায়রে ভাসি' ঘনীভূত সন্ধ্যার আঁধারে
> লীন হয়ে যাব ওই অন্তহীন অস্ত পারাবারে।

(—উপেক্ষিত)

এবং

কাঁদো কাঁদো অশ্রুধারে সিক্ত কর জীবনের শুষ্ক মরুবেলা,
রে অভাগ্য ! এখনো অনেক বাকী এই শুধু শুরু হোল খেলা।
আপনারে রিক্ত করি'
দিনে দিনে পলে পলে বর্ষ-মাস-যুগ-যুগ ধরি'
চিরন্তন তপস্যা তোমার অর্ঘ্যরূপে ধরিয়াছে কামনার পায় ;
জীবনের শ্মশান দেউলে তাই সত্যের দেবতা আজি কাঁদিয়া বেড়ায়।
(—উপেক্ষিত)

উদ্ধৃত অংশসমূহের প্রতিটি শব্দই আমার উপরোক্ত বক্তব্যের সাক্ষ্য দেবে, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অন্যপক্ষে আমি পূর্বেই বলেছি প্রকৃতিও শাহাদাৎ হোসেনের নিকট নিসর্গ মাত্র নয়। প্রকৃতি তাঁর মনে তাঁর অনুভবের সমার্থক হিসেবে প্রতীকায়িত দ্যোতনায় নতুন জন্মলাভ করেছে এবং তার প্রস্রবণও ঘটেছে অবলীলায়, অবারিত স্রোতে।

কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি ঃ

দখিনা-দোলার বিদায়-বাসরে
কুহেলীর ঘন ঘোমটা-আবরে
নগ্নিকা রাণী দাঁড়ায়ে হিমানী বরণ-মাল্য করে
বাঞ্ছিত ওগো, অভিসারে এস দীর্ঘ বরষ পরে।
কবির কণ্ঠে মন্দ্রিত রাগে
ছন্দিত গানে বন্দনা জাগে
মরমের ফুলে-রচা মালিকায় লহ এ অর্ঘ্যভার—
চির পরিচয়ে সুন্দর ওগো ! নন্দিত উপহার।
(—ঋতু মঙ্গল)

এবং

উড়াইয়া রঙীন উত্তরী
বনকুঞ্জে জাগাইয়া হিমশীর্ণা মাধবীর ঘুমন্ত মঞ্জরী
অতিথি এসেছে দ্বারে।

রূপ-রস-গন্ধ-ভারে
টলটল ধরণীর পুষ্পিত যৌবনে
চিত্রপক্ষ বিহঙ্গের লীলায়িত কাকলী-গুঞ্জনে
আসিয়াছে সুদূরের স্বপ্ন-অভিসারী
চিরন্তন রূপের পসারী।
(—বসন্তের অভিসার)

এবং

বীজনিয়া দূর হোতে দক্ষিণা সমীরণ
গন্ধ গীতির গাথা করিতেছে বিকীরণ।
সে গানে গন্ধে রঙে মাতোয়ারা মোরো মন—
ম্লান স্মৃতিপটে জাগে রূপছায়া কম্পন।
(—সুন্দর দ্বারে আজ)

এবং

আজি এ বিজন মাঠে নদীর কূলে
উদাস পথিক আমি সকল ভুলে—
চেয়ে আছি শরতের বিদায় বেলায়
পরপারে ওই দূর মেঘের মেলায়।
এ-পারে আঁধার,—হোথা জ্যোতির বিথার
আলোর তরণী মাঝে করে পারাপার।
(—শরৎ সাঁঝে)

শাহাদাৎ হোসেনের কাব্য সাফল্য, মৌলিকতা কিংবা রচনারীতির উৎকর্ষ নিয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে, তাঁর আলোচিত মানসিকতা আদৌ মহৎ কিনা সে বিষয়ও আমার বিচার্য নয়। এ ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হল শাহাদাৎ হোসেনের মানসের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করা মাত্র। এই মানসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সচেতনতাই সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে। তাঁর প্রয়োগশালার প্রকাশ-কাতর সুদীর্ঘ অস্থির উৎসরণে তিনি যে তাঁর স্বভাব থেকে কিছুতেই স্খলিত হন নি, অবচেতনেও তিনি যে তাঁর উপজীব্যের গোত্র থেকে বিচ্যুত নন—এইটেই বোধকরি তাঁর সহজাত প্রতিভার সবচেয়ে বড় স্মারক। এই integrity ও consistencyকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই।

আপাতঃদৃষ্টিতে শাহাদাৎ হোসেনের ভাষা ক্লাসিক মনে হলেও, আদতে তিনি ভাষা ও ভাবের উভয় ক্ষেত্রেই রোমান্টিক। ভাষা ব্যবহারে তিনি বাংলা ভাষার নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণায়ত ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করেছেন এবং সে কারণে অতিরিক্ত ঐতিহ্য-পন্থী হওয়ার দরুণ তাঁর রচনাশৈলী বাইরের দিক থেকে ক্লাসিক অবয়ব পেয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিব্যক্তিতে তিনি যেমন লীলা-উন্মুখ, ভাষা ব্যবহারেও তেমনি। শিল্পীর উন্মুখতা নিয়ে এই ভাষাকে ব্যবহার করতে গিয়ে তাঁর কাব্যকে রূপক, অনুপ্রাস, অন্তর্মিল, যমক ইত্যাদি প্রয়োগকুশলতার চাঞ্চল্য দিয়ে তিনি ভরিয়ে তুলেছেন। সৃজনের প্রত্যেকটি ভংগী যেন তিনি পরম আস্বাদে উপভোগও করেছেন। মূলতঃ ভাষা ও ভাবনা, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর মনের দ্যোতনাকেই ব্যঞ্জনাময় করতে চেয়েছেন। অপরপক্ষে রোমান্টিক মনের বোধকরি এই একটি অপর ধর্ম যে, সে খুবই অহং-মনোযোগী, নিজের বোধগুলোর ওপর তার চরম আস্থা। ব্যক্তি সচেতনার বিকাশোন্মুখতার সঙ্গে তাই রোমান্টিকতার যোগ খুব গভীর। বরং বলা চলে ব্যক্তি সচেতনতার এক পরিণত কাব্যিক পরিচয় হল রোমান্টিকতা। শাহাদাৎ হোসেনের মন তাঁর নিজের অহং সম্পর্কে যে অবিসম্বাদিত ধারণা এবং তাঁর বোধগুলো সম্পর্কে যে আস্থার সৃষ্টি করেছিল, বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিত্ব ও আস্থাই তাঁকে সম্পূর্ণ এক বিপরীত যুগে তাঁকে স্বপ্রতিষ্ঠিত রেখেছে, তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিকে প্রশ্নাতীত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ যে যুগে এই অহংবোধের রোমান্টিক উত্তেজনায় মগ্ন তখন বাংলা কাব্যে বিপরীত সুরের, বিরোধী অবস্থার সূচনা হয় নি। কিন্তু শাহাদাৎ হোসেনের সময়ে অহংবিরোধী সামাজিক কলরোলই প্রধান সুর, ক্রান্তিপারে এসে তা আরো নতুনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব অস্থির হয়ে উঠেছে নজরুলের নেতৃত্বে। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অতিক্রম করে নিজের নতুন সমৃদ্ধির সাহায্যে এই সময়েও অগ্রসরমান উদ্ভাবনায় আপন নেতৃত্ব অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু শাহাদাৎ হোসেন তাঁর মজ্জাগত পরিমণ্ডল থেকে নড়েন নি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের ডামাডোলও তাঁকে টলাতে পারে নি। তিনি অনড় হয়ে নিজের ভিন্ন কোটিতে অবস্থান করেছেন। আর ফলতঃ আমরা লক্ষ্য করি যে, তাঁর মধ্যে বিবর্তন নেই, উদ্ভিদ্যমানতা নেই, রূপান্তর নেই— আছে এক একান্ত উদ্ভবের মধ্যে অনন্ত উদ্রেক, অশান্ত উদ্বেগ। সেখানে এক ক্ষান্তিহীন যন্ত্রণার ব্যথিত গর্জন যেন অন্তর থেকে উঠে এসে, ঘুরে

সুরে একই সুরে গান গায়, একই ভাষাতেই হারায়, একই ভাষাতেই জেগে ওঠে। তাঁর এই বৃত্ত ছোট, সীমাবদ্ধ, কিন্তু বড় সত্য, এ তার অস্তিত্বের মতই সত্য! আর এই অস্তিত্বের উৎকর্ষ কি, তা আমি জানিনে, কিন্তু এই অস্তিত্ব যে এক পুরোপুরি কবির অস্তিত্ব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আবদুল কাদির (১৯০৬)

শাহাদাৎ হোসেন ও গোলাম মোস্তফার প্রায় বছর দশেক পরে আবদুল কাদির প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিলরুবা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সনে, কাব্যক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এর আগেই। রবীন্দ্র-বলয়ের মুসলিম কবিদের মধ্যে আবদুল কাদিরই একমাত্র কবি যিনি সৌন্দর্য-বোধ ও কল্পনায় মূলতঃ রবীন্দ্র-প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, মানসিকতা ও রুচিতে রবীন্দ্র-গণ্ডী অতিক্রম-প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিবর্তনটি সূচিত হয়েছে শুদ্ধ সৌন্দর্যবাদ-নির্ভর abstraction-এর জায়গায় ব্যবহারিক বাস্তবতার চিত্রায়ণ এবং ভোগ-উপলব্ধির রূপায়ণের বিদ্রোহাত্মক প্রকাশনার মধ্যে। এতে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁর জীবনবোধের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একথা আমি বলব না। তবে জীবনচেতনার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। বিমূর্তর স্থলে মূর্ত, অদেহীর জায়গায় দেহী এতে করে বাংলা কবিতায় আসন করে নিয়েছে। এতদিনের কল্পনায় অধিষ্ঠিত বস্তু বাস্তবে পর্যবসিত হয়েছে এর ফলে। অহেতুক আড়াল ছুঁড়ে ফেলে আধুনিক স্পষ্টবাদিতা এবং সূচনা পর্বের সংকোচ ঠেলে সত্যের মুখোমুখী হওয়ার ব্যক্তিতান্ত্রিক বলিষ্ঠতা এতে স্পষ্ট। যুগের অগ্রসরমানতার লক্ষণটাই যে এতে ধরা পড়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। এই বিদ্রোহের প্রশ্নমুখর অনাচারী অসংকোচ ঝুঁকিই পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার উন্মুক্ত, আত্মসংস্থিত, বিশ্লেষণমুখী প্রগতির দ্বার উন্মোচনে একটি প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে কার্যকরী হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে আবদুল কাদিরের পূর্বসূরী হলেন দেবেন সেন, মোহিতলাল এবং তাঁর সমযোগী হলেন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং কল্লোলের কতিপয় কবি। আবদুল কাদির অবশ্য আধুনিক কবিতার দ্রুত ও বিপুল প্রসারিত উৎসরণের মধ্যে অন্যত্র আর সহযোগিতা করেন নি, এমন কি, ভাষা ব্যবহারেও বাংলা

কাব্যের পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ের কার্যকারিতার সঙ্গে যুক্ত থেকেই তিনি যেন সন্তুষ্ট হয়েছেন। তবু এই বিদ্রোহে তাঁর ভূমিকা যে সুস্পষ্ট এতে কোন সন্দেহ নেই।

আবদুল কাদির মনোভাবে রোমান্টিক, এই রোমান্টিকতায় তিনি আবার বাস্তবতাবাদী যা ভোগবাদে পর্যবসিত। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের রুচিগত ভিন্নতা অত্যন্ত প্রকট, যদিও রবীন্দ্রসীমার মধ্যেই এর উপাদান নিহিত। আবদুল কাদিরের এই রোমান্টিকতার বাহন হয়েছে ঐতিহ্যপন্থী ক্লাসিকাল ভাষা। ক্লাসিকাল ভাষার বিশেষত্ব এই যে, এ খুবই বিষয়মুখী, বিশেষভাবে প্রত্যক্ষের, জাগরুক সত্যের অনুগত। আধুনিক বাংলা কবিতার বিশ্লেষাত্মক মনোভংগীর বাহন হতে গিয়ে এর ভাষাকেও ক্লাসিক প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হতে হয়েছে। ফলে আধুনিক কবিতার রূপ ও মন হয়ে উঠছে নিউ ক্লাসিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর চেতনা এ্যান্টি-রোম্যান্টিকও বটে। তবে আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষার ক্লাসিক রূপ অগ্রসর হয়ে দেশজ বাচনভংগী তথা প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দিকে প্রয়াসী। আবদুল কাদির বাংলা কাব্যের আধুনিকতা-সম্ভব ভাষা বিবর্তনের প্রধানতঃ এই ক্লাসিক প্রবণতাটুকুই উপজীব্য করেছেন, অর্থাৎ তাঁর ভাষা একান্তভাবে বিষয়মুখী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি অধিকতরভাবে বাংলা কাব্যভাষার ঐতিহ্যিক রসরূপের ওপরেই নির্ভর করেছেন। কেননা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে চলতি শব্দের প্রতি তাঁর সজাগতা আছে, আকর্ষণও আছে কিন্তু আগ্রহ বেশী নেই! ফলে তাঁর এই ভাষার রূপটা হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যগন্ধী, যদিও ভাবটা নতুনের, আগামীর! কিন্তু মূলতঃ যেহেতু তা বিষয়মুখী, সেজন্যে স্বচ্ছ, স্পষ্টতাপ্রবণ এবং প্রত্যক্ষের অনুগত।

উদাহরণ নেওয়া যাক:

দূরে বালিয়াড়ি গিরির চরণে ঝিঁঝির নূপুর বাজে,
অরণ্য-ছায়া জোনাকীর কায়া সাজায় মায়াবী সাজে।
পাতার চোয়ালে পুরিয়া পাইন পিইছে জ্যোৎস্না ধারা,
নিশীথিনী শ্বেত আঙ্গুলে বুলায় আলোকের একতারা।
কৌমুদীবাস পরি' নাম-তরু কাঁপে অসহ্য সুখে,
হাস্য শ্যামল গানের দাহন জ্বলে দেওদার-বুকে।
বন্য পশুরা গুহাতে ঘুমায় আঁধারের অবসাদে,
পাখা সঞ্চরি' ফিরে ঘুমপরী তোমারে বাঁধিয়া কাঁদে।

সে বাঁধন ছিঁড়ে পৌর্ণমাসীরে উজলিয়া তুমি জাগো,
সুন্দরী চন্দ্রা গো।
(—চন্দ্রা, বুলবুল, চৈত্র, ১৩৪৩)

এবং

মোর মনে জাগে একটি কামনা, আকাশে জাগিছে চাঁদ ;
সাগরে অগাধ উতল কামনা, তব দেহে অবসাদ।
* * *
আত্মার রসে নিরালা মজিয়া নিরুপমা হবে প্রিয়া
অপরূপা সেই তোমার মাঝারে ছাড়া পাবে মোর হিয়া।
হেরিবে মোদের সে মধু মিলন মহাকাল বিভাবরী
তুমি জাগো মোর বুকের আকাশে শর্বরী সুন্দরী।
(—রাত্রির রহস্য, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)

উপরোক্ত স্তবকগুলোর গঠনপ্রণালী যে ভাস্করের কুশলতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই। ভাষা ব্যবহারে যেমন বৈদগ্ধ্য রয়েছে তেমনি দেশজ রসবোধের সঙ্গে যোগ। প্রকৃতপক্ষে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আবদুল কাদির অত্যন্ত সচেতন শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। কবিতার communication-এর তাৎপর্য তাঁর কাছে স্পষ্ট এবং সে কারণে তাঁর বোধকে অন্য গ্রহণোন্মুখ বোধের দিকে প্রসারিত করে দেওয়ার দিকে তিনি সজাগ। চিত্র-নির্ভর ভাবের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পারম্পর্য রক্ষায় তাঁর অপরিমেয় শক্তির পরিচয় বিধৃত। সিকোয়েন্স-রক্ষার এই চিত্রকল্প-সম্বলিত প্রকরণ আধুনিক কাব্যরীতিরই অংশ। নীচের পংক্তি দুটো একথার সত্যতার আরো গভীরতর সাক্ষ্য দেবে।

গাঙ্ শালিকেরা উড়ে যাক্ দূরে ঠোঁটে লয়ে তৃণগুছি,
তুমি ডানা বাঁধো আমার ডানায়, সব ব্যথা যাক মুছি'।
(শর্বরী, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫)

জীবনানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ আমার বক্তব্য এই যে, আবদুল কাদিরের ভাষা গঠন এবং চিত্রকল্প নিজের মহিমায় স্বীকৃত, দীপ্ত, মনের জারক রসে জারিত হয়ে, বিমূর্ত বিকল্পরূপে মুক্তি পায় নি, খাঁটি রোমান্টিকদের বেলায় যা হয়। এখানে ভাষার এই ক্লাসিক সত্তা-পরিগ্রহ তাঁর রোমান্টিক সত্তাকে রোমান্টিকতার অবসান পর্যায়ের শেষ প্রান্তে টেনে এনেছে, যার আর একটি

ধাপ পরেই নতুন মনোভংগী, নতুন সংক্ষোভ, স্বতন্ত্র এলাকা। স্তবকগুলোর নারী-সম্পর্কবোধ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতের অভিব্যাঞ্জনা এই পরিবর্তনমুখী লতাতেই যে স্পন্দিত, সে আভাষ আমি প্রথমেই দিয়েছি।

বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করা যাক ;

ইহাদের সাথে চলে মোর নিশিদিন অনুরাগি,'—
বিশ্বজনারে বাসিয়াছি ভালো একটি নারীর লাগি।

(শর্বরী, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫)

এই পংক্তি দুটো স্পষ্টতঃই বিশুদ্ধ রোমান্টিক। কিন্তু

উলঙ্গ লাবনি তনু লুব্ধদৃষ্টি আমাকে দেখাও,
অঙ্গভি নির্য্যাস দিয়া মোরে তুমি লুপ্ত করে দাও
অন্তছায়া রূপের আঁধারে।
কবরী বিমান খোলো
মায়া যবনিকা তোলো ;
নিঃশ্বসিয়া কহ কথা, লয়ে যাও রহস্য আগারে !
মেঘের নূপুর পায়ে নাচো গাহো নয়ন সম্মুখে,
বর্ষণের নৃত্যে ভুলি' বক্ষোবাস ফেলি দাও সুখে,
নত-নেত্রে মুখ রাখো মুখে ॥

(লীলা অভিলাষ, কল্লোল, ১৩৩৩)

এই স্তবকটি কি শুধুই রোমান্টিক? এতে সম্ভোগ-সক্রিয়তার চিত্র এবং অনুরণনকে কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রূপায়িত ও হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টাই অধিকতর প্রধান নয়? এই রোমান্টিকতায় কি রিয়ালিজমের সংক্রমণ ঘটে নি? একটি অবস্থার পরিস্ফুটনের প্রতি আনুগত্য কি রোমান্টিকতার উধাও ডানাকে এখানে গুটিয়ে আনে নি? আর এমন মিশ্রণ ঘটলে রোমান্টিকতার নিখাদ চারিত্র কতখানি বিশুদ্ধ থাকে? আবদুল কাদির মূলতঃ প্রেমের কবি। আর বস্তুতঃ তিনি বাংলা কাব্যে প্রেমানুভূতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রান্তিকালের চিহ্ন ধারণ করেছেন— উপরোক্ত দৃষ্টান্ত এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে।

শাহাদাৎ হোসেন রবীন্দ্র-সৌন্দর্যচেতনার পরীক্ষিত পথে পর্যটন করেছেন। সে কারণে ভাষা ও ভাব ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত সংস্থিত বিষয়। মঙ্গল

কাব্যের পরিণতির যুগে ভারতচন্দ্রের কাছে ভাব ও ভাষা যেমন ছিল। ফলে শাহাদাৎ হোসেনের পক্ষে ভাষার লীলায় মেতে ওঠার সহজ ও অনুকূল পটভূমি ছিল। আবদুল কাদিরের মনে রাবীন্দ্রিক মূল্যবিশ্বাসে ফাটল ধরেছিল বলে তাঁর বক্তব্যের দিগন্তে যেমন নতুন চাঞ্চল্যের এবং অপরিহার্য আত্ম-নির্ভরতার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভাষাকেও এই দায়িত্ব পালনে যথাযথ করে না তুলে উপায় ছিল না তাঁর পক্ষে। তাঁর আঙ্গিক সজ্ঞানতা, ঐতিহ্য-নির্ভরতা, ছন্দ-নিপুণতা এবং সর্বোপরি কবিমন এ ক্ষেত্রের প্রাথমিকতা-জনিত স্খলন থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে। বিশেষ করে মোহিতলালের কাব্যচেতনা বোধকরি এ ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়ক হিসেবে প্রেরণা জুগিয়েছে, পথ নির্দেশ করেছে।

অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, আবদুল কাদিরের অনুভূতি গভীর আবার সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সজাগ বুদ্ধি এই গভীরতার পরিমাপকও হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মননশীলতা তাঁর আবেগকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণও করেছে। ফলে নজরুলের মত তার বেদনা লেলিহান নয়— সংগুপ্ত অথচ প্রবল এবং আন্তরিক। এবং সে জন্যেই তার পক্ষে একথা বলা কত সহজ যে,

রাতের সত্য, দিনে দেখি মিছে, তবু আনন্দ ভরে
অশ্রুজলের পেয়ালা ভরেছি পৃথিবীর খেলাঘরে।

একটি জ্বলন্ত সত্য পাথরে খোদাই করা যেন, যা গলে পড়বে না, বিচ্ছুরিত হবে না, অথচ অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই নিষ্ঠুর সত্য-উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য মানবিকতার নাটকীয় ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'সহচরী' কবিতার শেষ পর্যায়ে ঃ

যৌবনে কবে এই বনে দোঁহে দেখেছিনু দুটি পথে
জ্যোৎস্না নিশীথে নিঃসাড় নীড়ে ঢুলিছে নিমীল আঁখি
সহসা ব্যাধের শর একটিরে বিধিল অতর্কিতে
ঝাপটিয়া পাখা পড়ে সে ভূতলে, আরটি গুমরি' চিতে
আহতেরে ঘেরি দুই পাক ঘুরি উড়িয়া চলিল শেষে
নূতন সাথীর সন্ধানে কোথা নব প্রভাতের দেশে
হেথায় আঁধারে রক্তের দাগে ক্ষত ব্যথা ওঠে ভরি,—
মৃত্যু কাতর আমি যে বিহগ, চুমু দাও সহচরী।

মজ্জাগত ঐতিহ্যবোধ, সঞ্চালিত চিত্র, নিষ্ঠুর সত্য-উপলব্ধি আর সেই সঙ্গে জীবনের বিসর্জন অথচ নাটকীয়ভাবে তারই ভোগ-প্রস্রবণে উচ্চকিত মানবিকতা নিঃস্পৃহ দুঃখে, অন্তরঙ্গ মমতায় গভীর অথচ নীরব রেখায় জ্বলজ্বল করছে যেন এই স্তবকের রূপকে। এবং এইটেই বিশেষভাবে আবদুল কাদির—সংহত, পরিমিত এবং জীবন্ত। এ কণ্ঠ যখন বলে যে, 'মুক্তি মাগি ঝুরিছে যৌবন', তখন তা অত্যন্ত স্বাভাবিকই মনে হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাব্যকে একটি সঞ্চালিত চারিত্র ও শক্তিদানের প্রয়োজনে কতকগুলো প্রত্যয়, বিশ্বাস এবং বোধের প্রগাঢ়তা, প্রসারতা, বিশিষ্টতা এবং ঐকান্তিকতা থাকা চাই। আবদুল কাদির যৌবনের বলিষ্ঠতা এবং ভোগস্পৃহায় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে তাঁর দৃপ্ত পৌরুষ প্রশংসনীয় এবং বাংলা কাব্যের ঋজু স্বভাব আনয়ন-প্রয়াসে সহযোগিতাও করেছে তা। কিন্তু এইসঙ্গে এ বিষয়ও লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে, আবদুল কাদিরের কাব্য এই বিশিষ্টতার বাইরে প্রসারিত নয়, তা এই বিশিষ্ট দৃপ্ত মনোভংগীর মোহ ছাড়িয়ে তার স্বভাবের তেজকে বাংলা কাব্যের সম্প্রসারণ ও অগ্রসরমানতার ক্ষেত্রে প্রবাহিত করে দিতে পারে নি। ফলে তা যেন প্রতীকের মত স্থির হয়ে রয়ে গেছে। এর কারণ এই হতে পারে যে, প্রথমতঃ আবদুল কাদিরের উল্লিখিত প্রচলিতের প্রতি বিদ্রোহ এবং ঋজুতা সম্ভবতঃ শুধু যৌবনানুভূতির সঙ্গেই একাত্ম এবং দ্বিতীয়তঃ যৌবনবোধ তাঁকে যেমন নাড়া দিয়েছে, জীবনের অন্যান্য মূল্যবোধ বোধকরি তেমন নাড়া দেয় নি। সে কারণেই অন্য কোন গভীরতর প্রত্যয় ও বিশ্বাস তাঁর মধ্যে জাগরিত হতে পারে নি বলে মনে হয়। তাছাড়া অধিকাংশ কবির বেলাতেই একথা হয়তো সত্য যে, অনুশীলন এবং ধারাবাহিকতার মধ্যেই জগত-ঘটনার পারম্পর্যে কবির মনের সংগুপ্ত বৃত্তিগুলো ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। আবদুল কাদিরের ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতার অভাব পরিশেষে একান্তই ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১)

বেগম সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাঁঝের মায়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সনে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মায়া কাজল' প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনে এবং তৃতীয় গ্রন্থ 'মন ও জীবনে'র প্রকাশকাল ১৯৬০ সন (?)। বিশ বছরের বেশী সময়ের

রচনা এই তিনটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের কবিমনের বিকাশের পরিচয়ও এগুলোতে বিধৃত। এই সময়ের মধ্যে বেগম সুফিয়া কামালের কবিমনের সক্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে, এবং এই একটি অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার যে, গ্রন্থ তিনটির একটি অপরটির এপিঠ ওপিঠ নয়, শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তির মধ্যে বেগম সুফিয়া কামাল অবসিত হন নি। এই তিনটি গ্রন্থের ধারাবাহিকতায় একটি নিশ্চিত বিকাশের সূত্র প্রথমতঃ প্রেম-নির্ভরতায়, দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি-নির্ভরতায় এবং তৃতীয়তঃ 'মন ও জীবনে'র ব্যাপ্ততর প্রেক্ষিতে পর্যায় অতিক্রম করেছে। আলোচ্য কবিদের মধ্যে এমন বিস্তৃত পটভূমিতে রেখে দেখার সুযোগ সম্ভবতঃ আর কারো বেলায় নেই।

'অশ্রুকণা'র কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং 'নতুন খাতা'র কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের মত বেগম সুফিয়া কামালের মনে দাম্পত্য প্রেম তাঁর কবিতার এক গভীর উৎস হিসেবে কাজ করেছে। তবে গিরীন্দ্রমোহিনীতে এই প্রেম আবরণমুক্ত ও প্রত্যক্ষ; উপরন্তু তিনি একে জীবন-জিজ্ঞাসার এবং সৃষ্টিরহস্য ও দর্শনের উৎস হিসেবেও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সুফিয়া কামালের নিকট এই প্রেম আচরিত সৌন্দর্যানুভূতিমূলক - তাঁর কাছে এর ভিত্তি জীবনজিজ্ঞাসা নয়—জীবনাবেগ মাত্র! অপরপক্ষে কিরণধন অনেক ক্ষেত্রে যেমন চটুল, গভীর দুঃখকে সহজ করে দেখেছেন, বিয়োগের অবধারিত সত্য স্বাভাবিক শোকে স্বীকার করেছেন, বেগম সুফিয়া কামালের কাছে অবস্থাটা তেমনভাবে গৃহীত হয়নি। তিনি বরং সম্পৃক্তিতে, হতাশায়, ক্ষতিতে অনেক বেশী একাগ্র, আহত, আকুল এবং উৎকণ্ঠিত। এই পার্থক্যের কারণটা আর কিছু নয়, একজন প্রৌঢ় এবং একজন তরুণের নিকট একান্ত জনের সান্নিধ্যের ও বিয়োগব্যথার যে তারতম্য হতে পারে, তাই। একজনের কাছে সকল পাওয়াই নতুন এবং অপর পক্ষে হারানোর ফলে সকল আশাই অপূর্ণ রয়ে গেছে, আর একজনের পক্ষে বহুদিনের পাওয়াকে হারানো, যেখানে পাওয়ার তৃপ্তিকে কিছুতেই ভোলা যায় না। তবে সুফিয়া কামালের বৈশিষ্ট্য এই যে, পাওয়ার আনন্দে কিংবা বিয়োগ ব্যথাতেই মাত্র তিনি নিঃশেষিত হন নি। পৃথিবীর ব্যাপ্তির মধ্যে তিনি জীবনের মূল্য খুঁজতে চেয়েছেন পরিশেষে। তাঁর এই অন্বেষা প্রতিক্রিয়াজাত নয়, বাঁচবার তাগিদে নিজস্ব পাথেয় খোঁজার প্রচেষ্টাও এ নয়। বস্তুতঃ তিনি মজ্জাগতভাবে প্রেমানুভূতির কবি। এই প্রেমানুভূতি যেমন প্রকৃতি ও ব্যক্তি প্রেমের

ভোগ ও বিরহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে তেমনি তা মানুষের কল্যাণ-প্রচেষ্টার সমর্থনে ও সহানুভূতিতে জীবনকে ভালোবাসার মধ্যে মূর্ত। প্রথম জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষতি তাঁর মনে যে প্রবল আক্ষেপের সৃষ্টি করেছিল তা তাঁর কাব্যে স্বাভাবিক অন্যান্য বৃত্তিসমূহকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করেছিল সত্য, কিন্তু তিনি এই দুঃখকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই উত্তরণ একজন জীবনশীল কবিরই কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই যে, একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের কিংবা সেটার ক্ষতিজনিত দুঃখের সর্বাত্মকতা তাঁর শিল্পবোধকে বিপন্ন করতে পারে নি। তিনি বরং তাঁর অনেক আত্মগত বিক্ষোভ, একান্ত ব্যক্তিক মর্ম-যন্ত্রণা এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে সুন্দর ভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে পেরেছিলেন এবং এইটেই বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যসাফল্যের মূলধন।

'আমার নিশীথ' কবিতায় কবি বলেছেন ঃ

তোমার আকাশে দাও মোর মুক্ত বিচরণ-ভূমি,
শিখাও আমারে গান। গাহিব, শুনিবে শুধু তুমি।
মুক্তপক্ষ এ-বিহগী তোমার বক্ষেতে বাঁধি নীড়
যাপিবে সকল ক্ষণ স্থির হয়ে, চঞ্চল অধীর।
আঁধার গুণ্ঠন টানি' কানে কানে কব সেই কথা
যে-কথা গুমরে বক্ষে প্রকাশের কত ব্যাকুলতা।

o o o

তব শান্ত স্নিগ্ধ স্পর্শ লভি'
এ দেহ ধূপের ধূম বিথারিবে মৃদুল সুরভি।
অজস্র নক্ষত্রপুঞ্জে অনির্ব্বাণ উৎসব-দেওয়ালী
তোমার আকাশে শোভে; হেথা মোর প্রতিদিন খালি
চিত্ত করে নিত্য অভিসার
তোমাতে মিশায়ে যেতে, প্রিয়তম নিশীথ আমার।

কবি-দৃষ্টির তন্ময়তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ একমুখীন ব্যক্তিক প্রেম এখানে সার্বজনীন দ্যোতনা লাভ করেছে। একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের লক্ষ্য-উন্মুখতাকে ছাপিয়ে উঠেছে অন্তরের সৌন্দর্যানুভূতি, প্রকৃত কাব্যের অভিব্যঞ্জনা—চিত্রে, আকাঙ্ক্ষায়,

কল্পনায়। সমগ্র কবিতাটির মধ্যেই একটি জীবন্ত মন, উজ্জীবিত আশা, অস্থির আবাহন—আকাঙ্ক্ষার তীক্ষ্ণ রক্ত চমকানো কাব্যের মধ্যে ফুটে আছে।

বেগম সুফিয়া কামালের সামগ্রিক উৎসরণই একটা মৃদু স্বভাবের মধ্যে বিধৃত। এইটে নারীর স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য কিনা জানিনে কিংবা রক্ষণশীলতার উচ্চকিত পর্দা-ছেঁড়া এ-যুগের প্রথম মুসলিম নারী-কবির পরিবেশ-সজাগ সতর্কতা কিনা, তাও জানিনে। তবে একথা সত্য যে এই মৃদু স্বভাব তাঁর কাব্যে আলাদা এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে আরোপিত বা বহিরঙ্গ বিষয়ও এ নয়। বরং প্রাপ্তিতে বা হতাশায় উভয়ক্ষেত্রেই এই স্বভাবের সঙ্গে এক অন্তর্গূঢ় বেদনা মিশ্রিত হয়ে তাঁর কবিতায় এক মোহন প্রভার সৃজন করেছে। এই বেদনা কবিমনেরই প্রকাশ-আর্তির সঙ্গে জড়িত। বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যে সৌন্দর্যের এই দিকটা অস্বীকার করা যায় না।

ভোগ এবং বিরহ উভয়ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্য কিভাবে ফুটে উঠেছে নিম্নের উদ্ধৃতি দুটো থেকে তা বোঝা যাবেঃ

অন্তর মন্দিরে তার হ'ল যত পূজা-আয়োজন,
চিত্ত-তীর পরাজিত সিন্ধু-জলে জাগিল প্লাবন,
অবশেষে এল লগ্ন! জীবনের পূর্ণিমার রাতে।
একটি নিশীথ শুধু! কাটাল সে পূর্ণচন্দ্র-সাথে।...
অপূর্ব্ব পূর্ণতা লভি দেহ-সিন্ধু সশব্দ কল্লোলে—
ভাঙ্গিয়া চিত্তের তীর লুটাইল চন্দ্ররশ্মি-তলে
আকুল প্রণয়াবেগে উজ্জ্বলিয়া ব্যাকুল চুম্বনে—
ক্ষণ স্পর্শ লাভ করি বহি চলে আপনার মনে।

(— অনন্ত পিপাসা)

এবং

তোমারে চাহিনু বলি' দিলে তাই তব শেষ দান,
মোর শূন্য পূর্ণ করি একখানি ব্যথা ভরা দুঃখদীর্ণ গান!
ভালো তাই — তাই- ই ভালো মোর ;
তোমার দানের গর্ব্বে শুকাবে না মোর অশ্রুলোর।
তব দান মর্ম্মে মম তব স্পর্শ-সম যেন বাজে,
বেদনা বিক্ষোভে যেন ম্লানিমায় নাহি ছায় লাজে।

(— আশান্বিতা)

অন্যপক্ষে প্রধানতঃ প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপই বেগম সুফিয়া কামালকে আকর্ষণ করেছে ; এ ক্ষেত্রে তাঁর রচনা বর্ণনাপ্রধান। তবে নিজের ব্যথিত মানসিকতার ছাপ এতেও সংলগ্ন রয়েছে। তাঁর জীবনাশ্রিত কবিতাতেও প্রকৃতির অবলেপ উপমা এবং রূপকের মাধ্যমে এসেছে। কিন্তু বেগম সুফিয়া কামাল জীবনানুভূতির ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ কতিপয় মোটা দাগে উৎসারিত হয়েছেন, প্রকৃতির বেলাতেও তেমন চোখে দেখা অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত ধারণার বাইরে যান নি। 'গ্রীষ্ম' কবিতার নীচের পংক্তিগুলোতে

> আমি গ্রীষ্ম! আসিলাম বসন্তের পরিত্যক্ত পথে
> ধূসর, ঊষর, রুক্ষ! ধূলিম্লান, বহুদূর হতে।
> অপেক্ষি' আমার লাগি নাহি কেহ। শিশিরাশ্রু আঁখি
> সিক্ত নব কিশলয়। আমি গ্রীষ্ম পরম একাকী।

এই স্তবকে যতটুকু ব্যাপ্তি আছে তাঁর প্রকৃতিমূলক কবিতার ব্যাপ্তি ঠিক ততটুকু, তার বেশী নয়। ইতিমধ্যে প্রকৃতিচেতনা বাংলা কবিতায় এতখানি পরিণতি লাভ করেছে যে, এখানে নতুন অন্তর্দৃষ্টির উদ্বোধন ঘটাতে না পারলে, গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে বেগম সুফিয়া কামাল কখনো সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। সে-কারণে প্রকৃতির পারম্পর্যে তিনি সাড়া দিয়েছেন অনেক বেশী, কিন্তু সেই তুলনায় গভীরতা সেখানে অনেক কম। এই অভাব কি শুধুমাত্র মননশীলতার অভাবেরই দরুণ ?

বেগম সুফিয়া কামাল অবশ্য মধুর, অনন্ত, সুন্দর, চিরন্তন প্রভৃতি নন্দনতত্ত্ব-সম্পর্কিত শব্দ তাঁর কাব্যে বহুল ব্যবহার করেছেন। এ থেকে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি কবিতার শিল্পসত্তা সম্বন্ধে সজাগ। কিন্তু এই সজাগতা উপরোক্ত শব্দসমূহের ব্যবহারের মধ্যে যতখানি বিধৃত, সামগ্রিক রচনাপদ্ধতির মধ্যে এতখানি নয়। বিশেষ করে কাব্যের আঙ্গিক-বিষয়ে বেগম সুফিয়া কামাল বিশেষ অভিনিবেশ করতে সক্ষম হন নি। বস্তুতঃ বেগম সুফিয়া কামালের কবিপ্রতিভা সহজাত ; এবং তাঁর কাব্যের স্বাদও এই সহজাত প্রতিভারই প্রতিফলন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি স্বভাবকবি। কবি-অনুভূতি তাঁর সহজাত, কতিপয় কাব্যিক অনুরণনটি তাঁর মনের স্বাভাবিক বৃত্তি, এই মাত্র। অনুরণনটি সহজাত হওয়ার জন্যে এবং

অনুভবের স্বাভাবিকতার জন্যে, একটা অপরিহার্য সহজ উৎসরণ-প্রাবল্যই যেন তাঁকে নিয়তির মত অবধারিতভাবে ঠেলে নিয়ে গেছে। এর ফলে দুটো বৈশিষ্ট্য আমরা পাচ্ছি তাঁর কবিতায়। প্রথমতঃ প্রকাশনার সহজ স্বভাবের দরুণ তাঁর কবিতার ভাষা ও বাক্যগঠনরীতি ব্যবহারিক কথনপ্রণালীর কাছাকাছি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর রোমান্টিক মনের ভাবনা ও ভাষা উপরোক্ত কারণেই আমাদের জীবনের আটপৌরে ব্যবহারিক রোমান্টিকতার একটা পরিচয় তুলে ধরে।

ধর্মীয় এবং অনুষ্ঠানমূলক কবিতায় বেগম সুফিয়া কামাল আবদুল কাদিরের অনুরূপ। দুজনেই এ-ক্ষেত্রে মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করার প্রয়াসী। কিন্তু বিষয়টি ধারণামাত্রেই পর্যবসিত না থেকে প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ এবং বিশ্বাসে উজ্জীবিত হলে যে কাব্যিক গৌরব ও সঞ্চালন লাভ করতে পারে, বেগম সুফিয়া কামালের হাতে তা হয়নি। সে কারণে উপরোক্ত বিষয়সমূহের মর্মব্যাখ্যা রূপোলী ভাষায় ধর্মব্যাখ্যারই প্রকারান্তর প্রকাশ বলে অনুমিত হয়। তাছাড়া এই কবিতা-গুলোতে তাঁর মেয়েলি মেজাজের বিশিষ্ট প্রতিফলনটাও অনুপস্থিত বলে মনে হয়।

বেগম সুফিয়া কামাল প্রথম দিকে বেশ কিছু কবিতা পয়ারে লিখেছেন। তাঁর পয়ারে গাম্ভীর্যের পরিচয় রয়েছে। পরবর্তীকালে পয়ারের চর্চা তাঁকে আর তেমন আকর্ষণ করেনি লক্ষ্য করা যায়। মাত্রাবৃত্তের ওপরেই তিনি তাঁর প্রকাশ মাধ্যমের জন্যে নির্ভর করেছেন বেশী এবং তাঁর হাতে এর গাঁথুনিও সর্বত্র হালকাই রয়ে গেছে। আমি পূর্বেই বলেছি সুফিয়া কামালের কাব্য প্রচেষ্টার বিবর্তন রয়েছে—পরিণত সময়ে তিনি প্রবহমান জীবনেই উপজীব্য খুঁজেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, জীবনের দিকে মুখ ফেরানোর অর্থই জীবনের গভীরতর ও সাম্প্রতিকতর তাৎপর্যকে জানা নয়। এবং অপরপক্ষে জীবনশীলতার সঙ্গে সংযোগ চেতনাগত দিক থেকে ভালো; কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে উপযুক্ত আঙ্গিকে একে কাঠামো দেওয়ার ওপরেই এর কাব্য সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। বেগম সুফিয়া কামালের জীবনবোধের গভীরতার লক্ষ্যযোগ্য প্রমাণ নেই এবং তাঁর আঙ্গিক পরিশ্রমে নারাজ। তবে কি তাঁর এগিয়ে আসা বিফলে যাবে?

আলোচ্য সময়-পরিধির আর কয়েকজন কবি হলেন সুফী মোতাহার হোসেন, কাদের নেওয়াজ, মহীউদ্দীন, মঈনুদ্দীন এবং বেনজীর আহমদ। প্রথম

দুই জন রবীন্দ্র-বলয়ের কবি, অপর তিনজন নজরুল-অনুসারী। সনেট-রচয়িতা হিসেবে সুফী মোতাহার হোসেন বিশিষ্ট। তাঁর 'স্বপ্নাগতা' সনেটটি প্যাট্রার্কান আঙ্গিকের খাঁটিত্বের দিক থেকে একটি সার্থক নিদর্শন। ভাব ও ভাষার দ্যোতনায় এ একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত সনেট। কাদের নেওয়াজ জীবনের ছোটখাট বিষয় ও ঘটনার রূপকার কবি। একটি সহজ ব্যথিত সুর তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়, যদিও তিনি লিখেছেন কম।

একটি সত্য দুঃখজনক হলেও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সত্যটা এই যে, আলোচ্য কবিরা পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-উদ্যমের কাছে যেন চিত্রার্পিতের মত স্থির। জাতীয়তাবোধক কবিতায় যদিবা যোগসমূহের ক্ষীণ ধারা খুঁজে পাওয়া যায়, কাব্য বিবর্তনের মূলধারায় এদের মধ্যে কোন সংযোগ আবিষ্কার করা দুরূহ। গোলাম মোস্তফা অবশ্য আধুনিক কবিদের নিকট কোন প্রশ্ন নন। কেননা, তাঁর কাব্যাদর্শের যোগ্যতা এঁদের মনে সামান্যতম বিশ্বাস ও উৎসাহ সঞ্চার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অপরপক্ষে শাহাদাৎ হোসেন তাঁর সনাতনী-প্রচেষ্টায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। সেই বিচ্ছিন্নতা এতই পরিচিত যে, তা এঁদের মানস-ভ্রমণেরই সামান্য কৌতুহল উদ্রেক করতেও অক্ষম। একমাত্র আবদুল কাদিরের পক্ষেই একটি যোগসূত্র রচনার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর অক্ষয়ী পরিত্যক্ত রোমান্টিকতার মোহ কেন যেন ছাড়তে পারলেন না। শাহাদাৎ হোসেন বাক্যচ্ছটায় নিজেকে আবৃত ও দূরায়ত রাখলেন। আবদুল কাদির অতীত ও নূতনের দ্বন্দ্বে শুধু সাহসের ঝিলিক দেখিয়েই স্তিমিত রইলেন। অথচ এগিয়ে আসার উপযোগী কি সুন্দর ভাষা আর আঙ্গিক-চেতনাই তাঁর ছিল। আর বেগম সুফিয়া কামালের অগ্রগতি সমসাময়িকতার প্রেক্ষিত থেকে এতই বিচ্ছিন্ন যে তা নতুন কোন তাৎপর্যের জিজ্ঞাসাও জাগায় না।

তাছাড়া প্রকৃত আধুনিক কবিরা পুরোপুরি জীবনের কঠোর সত্যের মুখোমুখী, প্রেমের আদর্শায়নের একেবারেই বিরুদ্ধে, নিজেকে আনাচে কানাচে অন্বেষণ করেও তাঁরা জীবনের সহস্র মিলন-বিরোধের মধ্যে অন্বেষণে উদ্‌যোগী। কিন্তু আলোচ্য কবিরা তাঁদের আত্মকেন্দ্রিকতার বেড়ার এপারে আর এলেন না। আবদুল কাদির যদিও রোমান্টিক দেহাতীত প্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, কিন্তু শোকে দুঃখে সজাগ জীবনের মোহঘন পিপাসা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করল কই?

দ্বিতীয় পর্যায়

বিশ শতকের প্রথম তিন দশক বাংলা কাব্যে কতকগুলি মানবিক, সামাজিক এবং শৈল্পিক মূল্যবোধের সংস্থিত হওয়ার যুগ। এই মূল্যবোধসমূহ জীবন-চেতনা, সমাজ-চেতনা, যুগচেতনা, অধিকার-চেতনা, শ্রেণীচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র-চেতনা, প্রকৃতি-চেতনা, অধ্যাত্মচেতনা, ভোগচেতনা, ঐতিহ্য-চেতনা, নীতি-সজাগতা, সৌন্দর্য সজাগতা, আত্মসজাগতা, আঙ্গিক-সজাগতা এবং রুচি ও বৈদগ্ধ-পরিচর্যা প্রভৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রিশের যুগে সূচনা হল বিদ্রোহের। মানবিকতা ও আত্ম-উদ্বোধন-মূলকতার সঙ্গে নীতি ও নিয়মশৃঙ্খলার একটি বোঝাপড়া ত্রিশ-পূর্ববর্তী যুগে বাংলা কাব্যে সংস্থাপিত রূপ লাভ করেছে বলে লক্ষ্য করা যায়। সে ক্ষেত্রে ত্রিশের যুগে মন ও প্রবৃত্তির প্রশ্নাতীত স্বাধিকার ঘোষণার দাবী উত্থাপিত হয়েছে। এ অনেক প্রচলিতকে, প্রথাবদ্ধতাকে ভাঙতে, অনেক বিধি-নিষেধ, নীতি-নির্দেশকে লঙ্ঘন করতে উদ্‌গ্রীব। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই বিদ্রোহ-উদ্যম মানবিকতার মৌলিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে চায় নি। আর অন্যপক্ষে বাংলা কাব্যের ত্রিশ-পরবর্তী যুগটা হল অনেকটা গঠনমূলক। এর নিশ্চিত চারিত্রলাভ ঘটে চল্লিশের দশকেই। এই পর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্য হল প্রেক্ষিত ও পারম্পর্য-সজ্ঞানতা এবং বিশ্লেষণমূলকতা।

প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা ও বেগম সুফিয়া কামাল এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্রোহমূলক দ্বিতীয় পর্যায়ে আবদুল কাদির একজন বিশিষ্ট কবি। তৃতীয় পর্যায়ের অনেক উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, উল্লিখিত পর্যায়সমূহের সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ সম্ভব হলেও, সকল কবিকেই তাঁদের সংশ্লিষ্ট পর্যায়-প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ যেমন, জীবনানন্দ-মানস প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায় এমন কি তৃতীয় পর্যায়ের কিছু কিছু প্রাথমিক লক্ষণ সমূহ পর্যন্ত প্রসারিত; বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃতীয় পর্যায়ের প্রবণতায়

অবলীলায় সঞ্চরণ করেছেন, নতুনতর উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। এবং বিশেষ করে নজরুল—তাঁর উৎস প্রথম পর্যায়ে হলেও তিনি বাংলা আধুনিক কাব্যের—বিদ্রোহ এবং পুনর্গঠন—উভয় ক্ষেত্রেই উৎসের কাজ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় কোন পর্যায়-বিভাগই কবিদের ওপর তেমন প্রয়োগ করা যায় না, যেমন কাব্যের বিবর্তন ধারার গতি-প্রকৃতি ও লক্ষণ-বৈচিত্রের নির্ধারণে এর প্রয়োগ চলে।

বাংলা কাব্যের চতুর্থ পর্যায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত। এইটে মূলতঃ অব্যবস্থিত চিত্ততার যুগ। নতুন কোন মূল্যবোধ উদ্ভূত হচ্ছে না বলে কতিপয় পুরাতন ও শাশ্বত মৌলিক মূল্যবোধে অনুবর্তন, রোমান্টিকতার পুনরুজ্জীবন প্রভৃতিতে এই পর্যায়ের কাব্যপ্রচেষ্টা পর্যবসিত। যেহেতু কেবলই অনুবর্তন সে কারণে এ-ক্ষেত্রের মানবিক ও চিরন্তন মূল্যবোধ-নির্ভর কবিতা উদ্বোধন শিহরিত নয়, স্পন্দনচকিতও নয়। ফলে সৃজনী-চারিত্রও এদের গৌন। অন্যপক্ষে রোমান্টিকতার পুনরুজ্জীবন স্ববিরোধিতা, মিশ্রণ ও অবক্ষয়ে চরিত্রভ্রষ্ট, বিনষ্ট স্বাদ। এই পর্যায়ের কবিরা যে এই মৌলিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন নন—তা নয়। সেজন্যে তাঁদের অনেকেই কবিতায় বিশিষ্টতা আনার জন্যে ও মনোটনী ও পুনরাবৃত্তি ভাঙার জন্যে শব্দ ও আঙ্গিকের উৎকর্ষের ওপরই সর্বাধিক মনোযোগ দিচ্ছেন। যদিও অবশ্য 'শব্দই কবিতা'—এই ধুয়া কোন কাব্য-আন্দোলনের মাধ্যমেই 'শব্দই কবিতা' এই সত্যকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। তবে এতে যে কাব্যভাষার উন্নতি হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। অন্যপক্ষে কেউ কেউ নতুন পথের সন্ধান করছেন, কিন্তু তা এখনও কোন রূপ পরিগ্রহ করে নি। তবু এই প্রচেষ্টাতেই অবশ্য বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কারণ প্রতিনিয়ত নতুন না হয়ে কবিতা বাঁচতে পারে না। প্রত্যেক ক্রান্তিকালের ধাক্কায় নতুনত্ব লাভের মধ্যেই কবিতার প্রাণভোমরা বাঁধা। এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

॥ ২ ॥

আমাদের আধুনিক কাব্যধারার পথনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বসমূহের মধ্যে ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব এবং আবুল হোসেনই সর্বাধিক উল্লেখিত হয়ে থাকেন। আমি আগেই বলেছি বিশ শতকের বাংলা কাব্যের সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রসারিত বিবর্তনে তৃতীয় পর্যায়সীমার মধ্যে এঁরা পড়েন। অবশ্য এঁরা

সবাই এখনো লিখছেন। সেই সত্য হিসেবে রাখলে কথাটা একটু পাল্টে আরো যথাযথভাবে এই বলা উচিত যে তাঁদের কাব্য চারিত্র ও বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত পর্যায়ের মধ্যেই উদ্ভাবনা লাভ করেছে। পারম্পর্য ও প্রেক্ষিত-চেতনা এবং বিশ্লেষণ মূলকতাকে আমি এই পর্যায়ের মৌলিক লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছি এবং এই লক্ষণগুলিই এই পর্যায়ের কাব্য আন্দোলনকে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে—এ কথারও আভায দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যাইহোক এঁদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে আর একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, এই তিনজন কবি—ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব এবং আবুল হোসেনের মধ্যে যে উপরোক্ত লক্ষণসমূহ বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এ বিষয়ে আমাদের প্রথমেই সজাগ থাকা আবশ্যক। কেননা কবি হিসেবে এঁদের ব্যক্তিগত মানসের ভূমিকা কিছু কম নয়। অথচ এঁরা একই বিবর্তনের ভিত্তিপটে পা দিয়ে রয়েছেন। বৈচিত্র্য এবং মিলের সমন্বয় খুঁজতে হলে বিভিন্নতার এবং উৎসের সামগ্রিক তাৎপর্যটা অবশ্যই উপলব্ধি করা দরকার।

ঐতিহ্যবোধ ফররুখ আহমদের মজ্জাগত। ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত হতে না পারলে ফররুখ আহমদ লিখতেও পারেন না। ঐতিহ্যের জগতই তাঁর স্বাভাবিক স্বস্তির জগত। আরব্য-উপন্যাস, ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাকথা ও কোরানে উল্লেখিত কাহিনীর ঐতিহ্য একদিকে এবং অন্যদিকে মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্য তাঁর কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথমোক্ত দিকটা 'সাত সাগরের মাঝি' এবং দ্বিতীয়োক্ত দিকটা 'সিরাজুম মুনীরা'তে প্রধানতঃ প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর প্রেম, সৌন্দর্য ও উদ্বোধনমূলক কবিতার কোন ক্ষেত্রেই এ সত্যের খুব বেশী ব্যতিক্রম নেই। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্যে নীচে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

(১) ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেঁহুশ
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া প'রেছে শিলাদৃঢ় আবলুস
পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;
নামে নির্ভীক সিন্ধু শকুন দরিয়ার হাম্মামে।

(—সিন্দবাদ)

(২) আল্‌বুর্‌জের চূড়া যেন এক উড়ে আসে কালো দেউ

(—বা'র দরিয়ায়)

(৩) যেন সুলেমান নবীর শিকলে বন্দী বিশাল জীন

* * *

কাল মাস্তলে ঝড়ের কান্না শুনেছি একলা জেগে
শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মরুভূর কূলে কূলে,
বাদামের খোসা এসেছিল এক ভেসে তুফানের বেগে
আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে দুলে

* * *

ডাকে বাগদাদী খেজুর শাখায় শুক্লা রাতের চাঁদ,
মাহ্‌গীর বুঝি দজ্‌লার বুকে ফেলে জ্যোছনার জাল
কোমল কুয়াশা স্নেহে যেথা মাটি পেতেছে নতুন ফাঁদ
ঘরে ফেরবার সময় হয়েছে আজ।

* * *

খিজিরের সাথে পেয়েছি আমরা দরিয়ার বাদশাই

(—দরিয়ার শেষ রাত্রি)

(৪) শাহেরজাদীর ঝরোকায় এসে সাইমুম স্নায়ু শ্রান্ত শিথিল,
খোঁজে ওয়েসিস মরু-সাহারায় চিড় খাওয়া দিল শূন্য নিখিল।

(—শাহ্‌রিয়ার)

(৫) আখরোট বনে
বাদাম খোবানি বনে
কেটেছে তোমার দিন।
হে পাখি শুভ্র তনু

* * *

ইরান বাগের বেদনা ওড়ায়ে এনেছো পক্ষপুটে

(—আকাশ নাবিক)

(৬) কায়খস্‌রুর স্বপ্ন কংকালের ব্যর্থ পরিহাস
জীবাণুর তনু পুষ্টি করিয়াছে কবে তার লাশ।

* * *

এই সব রাত্রি শুধু একমনে সেই কথা শোনে,
সেতারা উড়িছে তার অন্ধকার দুরন্ত পবনে।

(—এই সব রাত্রি)

(৭) কোন অজ্ঞাত বন্দরে এসে লাগলো সেই জাহাজ
মনে পড়ে নাকো আজ,
তবুও সেখানে ভ'রেছে জাহাজ মারজানে মর্মরে
এইটুকু মনে পড়ে।
(—সাত সাগরের মাঝি)

ইত্যাদি। কিন্তু ফররুখ আহমদের মনে বাংলা প্রকৃতি এবং বাঙালী অভিব্যক্তি ঐতিহ্যের যে কিছুই ছায়াপাত করেনি, তা নয়। তারও কিছু নিদর্শন রয়েছে ; যেমন,

(১) তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম
অন্তরের দ্রাণ,
দিন-রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
দীর্ঘ পদ্মনাল বেয়ে পাপড়ির 'পরে∴
ভ'রে ওঠে মনের আকাশ দীর্ঘশ্বাস অপরাহ্ন বেলা
পাপড়ির দ্বার রুধি' পদ্মের সুরভি কোথা চলেছে একেলা,
পিছে ফেলে পরিত্যক্ত পাপড়ির বাস,
ভেসে চলে মন, দূরে ভেসে চলে সুরভিপ্রশ্বাস
......জানিনা কোথায়—
ব'সে আছি অন্ধকারে নিশীথ-প্রচ্ছায়,
পাপড়ি যায় না দেখা, আজ শ্রান্ত ধমনীর আগ্নেয় উৎসব।
শুধু একা করি অনুভব
তোমার হারানো গন্ধ সুরভি-প্রশ্বাস,
মনের অলিন্দে শুধু দেখা দেয় তন্দ্রাতুর তোমার আকাশ।

এবং,

মুগ্ধ মন আকুল সৌরভে
নাহি জানি ভুলেছে সে কবে
রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ ভীরু বাতায়নে,
রুদ্ধ কারাদ্বার ভাঙি' আজ সে করিছে দূরে কার অন্বেষণ।

এবং,

মনে হয় আকাশ কুসুম
তোমার সন্ধান।
তবু লাগে জোয়ারের টান,

সুপ্তির অতলে যেয়ে হানা দেয় জাগ্রত চেতনা,
কী অসহ্য বেদনায় লাগে বুকে সৌরভ মূর্ছনা।
বন-চামেলির স্রোতে ভেসে যাই কোথায় সুদূরে
ভারাক্রান্ত তনু ছেড়ে মন আজ ফেরে ঘুরে ঘুরে—দক্ষিণ বাতাসে,
নিজেকে হারায়ে ফে'লে ছুটে চলে ব্যাকুল আশ্বাসে।
প'ড়ে থাকে ধূলিমুঠি, প'ড়ে থাকে ভ্রান্ত অহংকার।
ব্যথাতুর হ'য়ে ওঠে সমগ্র চেতনা; সত্তা, মনের কিনার।
(—ঝরোকায়)

রাত্রিভ'র ডাহুকের ডাক ... ...
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির।
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশা খেলা আজ প'ড়ে থাক,
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।
তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।

এবং,

বেতস বনের ফাঁকে চাঁদ ক্ষয়ে আসে
রাত্রির বিষাদ ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন সাঁতোয়া আকাশে।

এবং,

হয়তো তোমাকে চিনি, চিনি ঐ চিত্রিত তনুকা,
বিচিত্র তুলিতে আঁকা
বর্ণ সুকুমার।
কিন্তু যে অপূর্ব সুরা কাঁদাইছে রাত্রির কিনার
যার ব্যথাতিক্ত রসে জ'মে ওঠে বনপ্রান্তে বেদনা দুঃসহ,
ঘনায় তমালে, তালে রাত্রির বিরহ
সেই সুর পা'রিনা চিনিতে।

কিন্তু দেশজ সূত্রের এই সম্পন্নতা ফররুখ আহমদে এত দুর্লভ যে, এর সঙ্গে তাঁর কোন সত্যিকার সংলগ্নতা আছে বলে মনে হয় না। বরং তাঁর প্রবণতা

সম্পূর্ণই আরব সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক এবং মুসলিম হিসেবে এ-ক্ষেত্রে তিনি সচেতন ভাবেই একাত্মতা অনুভব করেছেন: 'মোরা মুসলিম দরিয়ার মাঝি মওতের নাহি ভয়!' দেশ এবং কাল উভয় দিক থেকে দূরায়ত ঐতিহ্যের প্রেরণায় উজ্জীবনের মূলসূত্রটাও এইখানেই। তবে ফররুখ আহমদের কাব্যের সঙ্গে জীবন ধারণার বিমূর্ত প্রতিক্রিয়ার যে সংযোগ রয়েছে তা একান্তই অস্পষ্ট নয়। কিন্তু সেখানে পরিপার্শ্ব ও সাম্প্রতিক জীবন নেই। জীবনের উদ্ভিদ্য-মানতা (evolving life) নেই বলে আধুনিক কাব্যের অন্যতম লক্ষণ বিশ্লেষণ-ধর্মিতাও নেই। ফররুখ আহমদ মুসলিম পুনর্জাগরণের আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর কাব্যে ঐতিহ্য ও আদর্শের পারম্পর্য কী তা সহজেই বোধগম্য এবং কোন প্রেক্ষিতে এই সমন্বিত উদ্বোধন তাও সহজেই অনুমেয়, কিন্তু তাতে ঐতিহ্যের স্বপ্ন যতখানি লাবণ্যে উদ্ভাসিত, জীবনের দ্বান্দ্বিক অবশ্যম্ভাবিতা ততখানি স্পষ্ট নয়। ফলে আদর্শের অপরিহার্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতাও সেখানে অনুপস্থিত। অপরপক্ষে জীবনধারণার সঙ্গে আদর্শের যোগ স্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রতীক ও রূপক দ্যোতনার মাধ্যমে। তাই ফররুখ আহমদের ঐতিহ্য ব্যবহার প্রতীক-রসে সিঞ্চিত। কয়েকটি উদাহরণে কথাটা পরিষ্কার হবে।

(১) নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দবাদ!...
পাকে পাকে ঘুরে তীরবেগে ছুটে আবর্তে দিশাহারা
ক্ষুধার ধমকে ঘাস ছিঁড়ে খেয়ে আকাশে জাগায়ে সাড়া,
জালিমের চোখ আগুনে পোড়ায়ে, গুঁড়ায়ে পাপের মাথা,
দেখেছি সবুজ দরিয়া জাজিমে র'য়েছে পাতা।
(—সিন্দবাদ)

(২) হয়তো সে ভুল, হয়তো সে ভুল নয়
তুফানের মুখে জমা হয় বিষ, জমা হয় সংশয়,
জাহাজের হাল নির্মম হাতে ঘোরাও এবার মাঝি।
এ পথের শেষ, এ গতির শেষ কোথা,
কোথায় মাতাল ছুট্‌ছে অন্ধ তাজী?
(—বা'র দরিয়ার)

(৩) সওদাগরের দল মাঝে মোরা উঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।

ওকি বাতাসের হাহাকার,—ওকি রোণাজারি ক্ষুধিতের।
ওকি দরিয়ার গর্জন,—ওকি বেদনা মজলুমের!
ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী!
পাঞ্জেরী!
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী॥

(—পাঞ্জেরী)

(৪) পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর।...

স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা—
এ পাশবিকতা,
শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ
বিষাইছে দিনের পৃথিবী;
রাত্রির আকাশ।

এ কোন সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে করে পরিহাস?
কোন ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে করে পরিহাস?

(—লাশ)

(৫) আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টীকা;
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হয়েছে দাস, নারী হল লুণ্ঠিতা গণিকা।

অনেক মঞ্জিল দূরে প'ড়ে আছে মানুষের ঘাঁটি,
এখানে প্রেতের বহির্বাটি,
এখানে আবর্তে পথহারা
চলিতেছে যারা
তাদেরে দিয়েছে ডাক জড়তার ক্রূর আজদাহা,
শতকের সভ্যতায় এরা আজ হ'ল তাই অন্ধ, গুমরাহা।

(—আউলাদ)

(৬) আজকে তোমার পাল উঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ওঠাতেই হবে।
(—সাত সাগরের মাঝি)

(৭) নিশান আমার কি স্বপন তুমি দেখছো আজ
নিশান আমার শীর্ণ মুঠিতে
পেতে চাও তুমি মহা নিখিল ?
ক্ষুধিত মাটিতে সে নয় তাজমহল,
মানুষের মাঠে বিরাণ মাটিতে
এবার ফলাবে তাজা ফসল,
এবার নিশান থামবে না তুমি
গড়তে শিলার তাজমহল,
এবার তোমার যাত্রা যেখানে
ক্ষুধা বিশীর্ণ অশ্রুজল,
এবার তোমার যাত্রা সে পথে
যেথা উমরের পায়ের ছাপ,
জং ধ'রে যেথা প'ড়ে আছে হায়
আলীর হাতের জুলফিকার,
পিঠে বোঝা নিয়ে ক্ষুধিতের দ্বারে
চলে একটানা পথ তোমার ;
দেখো সিরাজুম মুনিরা জ্বলছে
মুছে দিতে সব ফাঁকা প্রলাপ...
(—নিশান)

উদ্ধৃতিগুলো এতই প্রাঞ্জল যে, কী আদর্শে এ উজ্জীবিত এবং ব্যবহৃত প্রতীকের আড়ালে মূল বক্তব্যটাই বা কী তা বোধকরি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। প্রতীকের আধারে যে ঐতিহ্য ও আদর্শ অবিমিশ্র হয়েছে সে দিকেই আমি এ-থেকে ইংগিত দিতে চাচ্ছি। নজরুল-কাব্যেও মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, যদিও তা প্রতীকী আধারে উপস্থাপিত নয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ঐতিহ্য চেতনার সাহায্যে নজরুল তাঁর কাব্যে জীবন ও জীবন-জিজ্ঞাসার বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ফররুখ

আহমদের কাব্যে এর দ্বারা প্রতীকী আমেজ এসেছে বটে, জীবনের প্রবল তোড় সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। সাম্প্রতিকতা-সংলগ্ন সুরের একটি আভাষিত সমার্থকতা সেখানে উপলব্ধি করা যায় মাত্র। তবে পরিশীলনের অভাবে নজরুলের বিপুল জীবন-উপকরণ সম্পূর্ণ কাব্য-উপকরণে পরিণত হয়ে উঠতে পারে নি। অন্যপক্ষে ফররুখের ঐতিহ্য-উপকরণ কাব্য-উপকরণে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই সাফল্যের জন্যে জীবনের স্বাভাবিক সম্প্রসারণের সম্ভাবনাকে যেন তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে বলে মনে হয়। সিদ্ধির এই সহজ পথটাকেই একক ও একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরাতে অসম্পূর্ণতা আছে বৈকি।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কয়েকটি কবিতাকে ব্যতিক্রম হিসেবে অবশ্যই গণ্য করা প্রয়োজন। কবিতা কয়টি হলঃ ঝরোকায়, ডাহুক, লাশ এবং আউলাদ। নিঃসন্দেহে এই কবিতাগুলোতে ঐতিহ্য, আদর্শ এবং জীবন একটি সমন্বিত ভিত্তি পেয়েছে। এই ব্যাপকতার দিকে পা বাড়াতে অবশ্য ফররুখ আহমদের মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। বরং অতীতের কাল্পনিক ভ্রান্তি ও ত্রুটির প্রতি বিমুখতায়, পরিমার্জনার বিদ্রোহে এবং ভবিষ্যতের কাল্পনিক সংশোধনের উদ্যোগে, পুনর্গঠন-সম্ভাবনায় তিনি একনিষ্ঠ উৎস খুঁজে পেয়েছেন—তাঁর মানস শুধু এই বৃত্তেই আবর্তিত হয়েছে পরবর্তী সময়েঃ

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি'
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী;
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি'
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের শর্বরী।

(— পাঞ্জেরী)

সে যাই হোক, এখানে একটি বিষয়ে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, অতীতটা কাব্য নয়, অতীতকেন্দ্রিক আদর্শবোধও কাব্য নয়। কাব্য অতীতনির্ভর দূরায়ত স্বপ্নটা; আদর্শভিত্তিক উদ্বুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাটা! সুতরাং ফররুখ আহমদের মুসলিম পুনর্জাগরণ-বোধ এবং সে বিষয়ের বক্তব্যকে কাব্য বলে ভুল করার কোন কারণ নেই। কাব্য এর পরিপ্রেক্ষিতে যে ধ্যান, কল্পনা ও চিত্রায়িত স্বপ্ন

ফুটে উঠেছে তা। এ-ক্ষেত্রে সামান্য হেরফের অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ডেকে আনে। ফররুখ আহমদই এই সঙ্কটের এক বিশিষ্ট প্রমাণ। কেননা এই পরিক্রমায় তাঁর সফলতা ও বিফলতার পাল্লা সমানভাবে ভারী। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থকে সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যায়। অন্যপক্ষে 'সিরাজুম মুনীরা' একটি কাব্যগ্রন্থ বটে, কিন্তু এর প্রকৃত কাব্যমূল্য সম্পর্কে আশা করি কোন মোহ থাকার কথা নয়। অবশ্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতা ও ধর্মীয় বিষয়ের নামমাহাত্ম্য ও গুরুত্বই যদি আমাদেরকে প্রথমেই বিচলিত করে ফেলে তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। অথচ কাব্যগুণ যেখানে গৌণ হয়ে পড়েছে এমন উৎসরণের দিকেই ফররুখ আহমদ সর্বাত্মকভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছেন ধীরে ধীরে। বেশ কিছুকাল আগের এমন একটা নমুনা হল ঃ

আল্লার দেওয়া বিশ্ববিধান
        ইসলামী শরিয়ত
সে বিধানে মোরা গড়িয়া তুলিব
        এই পাক হুকুমত ॥...
তৌহিদে রাখি দৃঢ় বিশ্বাস
আমরা স্বজিব নয়া ইতিহাস
দেবো আশ্বাস তুনিয়ার বুকে
        দেখাবো নতুন পথ ॥
সারা মুসলিম তুনিয়াকে বেঁধে
        একতার জিন্‌জিরে
ফিরায়ে আনিব হারানো সুদিন
        নয়া জমানার তীরে ॥
আলী, ওসমান, উমরের দান
নেব তুলে মোরা জেহাদী নিশান
নেব মোরা ফের আবুবকরের
        সত্য সে খিলাফত ॥

(— তারানা-ই-পাকিস্তান)

এইটে একটি গান। পুরো উদ্ধৃত করলাম এইজন্য যে, এতে ফররুখ আহমদের আদর্শের মূল বক্তব্যটা বিধৃত হয়েছে। তিনি পাকিস্তানের মধ্যে

খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের পুনঃসংস্থাপনের স্বপ্ন দেখেছেন। এবং তাঁর এ স্বপ্ন যে সিদ্ধান্তে উৎকর্ষ পেয়েছে তা হল ;

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়—শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী, পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ ; ঘুমঘোরে যখন বেঁহুশ ;
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে ;
যার স্বার্থে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তায়ীর ।।
(—নৌফেল ও হাতেম)

নিশ্চিতভাবেই এতে কাব্যবোধের চেয়ে কর্মপন্থা বড়। একটি কবির বিকাশের পক্ষে এ যে কত আত্মবিরোধী তা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসমাত্রই প্রমাণ দেবে। ধর্ম বা আদর্শচেতনা বা কোন প্রকার চেতনার সঙ্গেই কাব্যের বিরোধ নেই, কিন্তু তা যদি কবির বোধ ও কল্পনাকে গ্রাস ও আচ্ছন্ন ক'রে কেবল প্রচার ও কর্মসূচীর ভাষা হয়ে ওঠে মাত্র তাহলে সেক্ষেত্রে কবিতার অপমৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটো শিরোনামা ও প্রসঙ্গ টীকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে ওতে যুগচিহ্নরও কিছু পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। নজরুলও মুসলিম গৌরবের উল্লেখে জাগরণমূলক উদ্দীপনার সঞ্চার করতে চেয়েছেন। সেখানে মানবিকতারই প্রধান আবেদন, সমমর্মিতাই প্রধান সুর। কিন্তু ফররুখ আহমদ যতই এগিয়ে গেছেন ততই তাঁর লেখার বিশিষ্ট আদর্শ, বিশিষ্ট আন্দোলন বিচ্ছিন্ন পথ এবং স্বাতন্ত্র্য-সীমিত প্রচার প্রধান হয়ে উঠেছে। কাব্যের আবেদন সার্বজনীনতার ভিত্তি থেকে সরে এসেছে ধীরে ধীরে। এবং তদুপরি সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, ফররুখ আহমদ তাঁর আদর্শের সঙ্গে সাম্প্রতিক উদ্ভিদ্যমান জীবন জটলার যোগ ঘটাতে পারেন নি। জীবনের জীবন্ত প্রবহমান স্রোত কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাও তাঁর কাব্যকে স্পর্শ করে নি। কয়েকটি ধারণাগত মৌলিক প্রত্যয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং তার বিমূর্ত প্রক্ষেপেই মাত্র তিনি সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন। আয়ুর অগ্রসরমান অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে কোন মূল্য পায় নি—তাঁর কাব্যে তা পরিশীলিত রূপায়ণে (pure experience) মণ্ডিত হওয়ার সুযোগও পায় নি।

অথচ নজরুলের উদ্যত কণ্ঠের অব্যবহিত পরেই 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে ফররুখের উদ্‌গত তন্ময় কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। নজরুলের উচ্চকিত আবেগ উদ্বেলতার পরে ফররুখের মথিত মন্দ্রিত ধ্বনি, ব্যথিত সংযমে স্বাপ্নিক সাহসের উদ্বুদ্ধ পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। নজরুলের অতীত-উল্লেখ যেখানে জনসভার উল্লেখের মত শিরায় ঘা দিয়েছে সেখানে ফররুখের উল্লেখ স্পর্শ হেনেছে চেতনায়, মননে, মনোগঠনে, মানসে। নজরুলের attitude ছিল শুধুই জাগরণের, ফররুখের ছিল উদ্বোধনের। লক্ষণীয় যে ফররুখের উল্লিখিত গুণগুলোর সবগুলোই অধিকতর পরিণত কবি-গুণ। তার অর্থ এই যে, ফররুখ আহমদের কবি-সাফল্যের সম্ভাবনা নজরুলের চেয়ে বেশী ছিল! কিন্তু আশ্চর্য এই যে নজরুলের সমান কবি-সাফল্যও তিনি অর্জন করতে পারেন নি। এমন কি চেতনাগত দিক থেকে নজরুলই তাঁর চেয়ে অধিকতর আধুনিকও রয়ে গেছেন! ফররুখ আহমদের সম্ভাবনা 'সাত সাগরের মাঝি'তেই আভাষ দিয়ে বিলীন হয়ে গেছে—এই প্রতিশ্রুতি সার্থকতার পথে আর এগোয় নি! এর কারণ এই যে, নজরুল অধিকতর কম কবি-পরিশীলন নিয়েও জীবনের বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যে আবর্তিত হয়েছেন, প্রবহমানতায় তিনি সংযোগ রেখেছেন, সঞ্চারিত হয়েছেন। ফররুখ আহমদ স্থানকাল পাত্রের সঙ্গে বর্তমানের ঘটমানতার সঙ্গে, সাম্প্রতিকতার সংক্ষোভের সঙ্গে যোগ আর কিছুতেই ঘটিয়ে তোলেন নি —অর্থাৎ মুহূর্তের পটে তিনি আর জাগলেনই না!

অথচ বিষয় ও আদর্শ যে ভাষায় কাব্য হয়, যে ছবিতে চিত্রকল্প হয়, যে মূর্ছনায় লিরিক হয়, যে ধ্যানে আত্মগত হয়, যে কল্পনায় বাস্তবতা ও ঘটমানতা crudeness ছাড়িয়ে ওঠে এবং যার দ্বারা বিশেষ বক্তব্যের প্রশ্ন-সাপেক্ষতার উর্ধে শৈল্পিক রসের স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে তা ফররুখের অনায়ত্ত ছিল না। ('সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ এর প্রমাণ।) এবং কী করে এই কাব্যপদ্ধতি জীবনের সঙ্গে মেশে তারও পরিচয় তার মধ্যে রয়েছে। ('সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের ডাহুক, লাশ, আউলাদ, ঝরোকায় এবং কয়েকটি সনেট এর নিঃসন্দেহ প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত।) কিন্তু ফররুখ আহমদ বোধকরি এই কাব্যের পথেই উৎসারিত হওয়াটা খুব যথাযথ ও ঐকান্তিক মনে করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত আদর্শ কাব্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে, আদর্শ-সাধনাকেই আঁকড়ে ধরেছেন প্রাণপণে। ফলে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়টা নেমে এসেছে সহজেই, সরল পথেই।

Yeatsএরও প্রথম দিকের কবিতায় ন্যাশনালিজম-কেন্দ্রিক আদর্শবোধ প্রধান ছিল। কিন্তু Yeats বুঝতে পেরেছিলেন শুধু এমন নির্ভরতার মধ্যে কাব্যের অগ্রসরতা ও বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি জেনেছিলেন, "the modern world is more powerful than any propaganda, that no nation can isolate itself from the crisis of the modern world."—একজন আধুনিক কবির পক্ষে এই জীবনদৃষ্টির প্রয়োজন যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয়। ফলে Yeats এগিয়ে গেছেন। আর তাছাড়া নিজের দেশের legend ও folk loreএর ওপর Yeatsএর দক্ষতাও ছিল অপরিসীম। এতে করে ঐতিহ্য-সঞ্চরণে দেশের হৃদয়-অভ্যন্তরে প্রবেশের স্বাভাবিক সূত্রও Yeatsএর সহজাত আয়ত্তে ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফররুখ আহমদের ঐতিহ্যবোধের একদিকে একনিষ্ঠ অচল সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদিকে দেশজ সূত্র থেকে বিচ্ছিন্নতাই যে তাঁর কাব্য-ভাবনাকে স্থবির, প্রবাহচ্যুত ও আত্মসর্বস্ব করে তোলার অন্যতম কারণস্বরূপ তা সহজেই ধারণা করা যায়। Yeatsএর ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাঁর আজীবন প্রিয়া Maude Gonneর উগ্র বিপ্লবী আদর্শ এবং O' Leary'র প্রভাবিত দেশপ্রেম তাঁকে এককভাবে আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। এককালে Yeats, যখন তিনি "still a young man he began to conceive a plan for bringing together the two halves of Ireland so as to build a 'unity of life' that would produce a great literature" ('Crisis in English Poetry'—V. D. S. Pinto)—এমন ধারণাও পোষণ করতেন। তিনি এই ধারণাতেও নিজেকে ধরে রাখেন নি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রথমতঃ কোন আন্দোলনের কর্মসূচীর রূপায়ণ কবির দায়িত্ব নয় এবং দ্বিতীয়তঃ কোন একক বিষয়ের প্রতি আজীবন সীমাবদ্ধ একমুখীনতা কখনও শিল্পে সাহিত্যে মুক্তি আনতে পারে না। কবির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতা অবশ্যই রক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তা কেবলই পুনরাবৃত্তির মধ্যে বিধৃত হলে কবি বাঁচেন না। তাঁকে অবশ্যই প্রবহমান জীবন ও পরিপার্শ্বের মধ্যে সত্য খুঁজতে হবে। কেননা একজন কবির আত্মবিকাশ হল তাঁর কাব্য-সাফল্যের জন্যে একটি মূল চাহিদা। এবং এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপত্তি ঘটায় যা তা হল পুনরাবৃত্তি ও সীমাবদ্ধতার একঘেঁয়েমি। কবির মনে স্বভাবতই সচলতা থাকবে, অগ্রসরপ্রবণতা থাকবে,

প্রসারতা ও বিস্তৃতি থাকবে। কেননা কবিই একমাত্র স্রষ্টা—নতুন সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাওয়াই যার মূল লক্ষ্য। এমন কি তিনি নিজেই নিজের অনুকরণে স্থির থাকতে পারেন না। তাহলেই তাঁর মৃত্যু! ফররুখ আহমদের এই সঙ্কট আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে দেশজ ভিত্তিতে তিনি তাঁর উদ্ভাবনার উৎস খুঁজে পান নি বলে। Yeats-এর অভিজ্ঞতা বোধ করি এ ব্যাপারে তাঁকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারত।

ফররুখ আহমদ আমাদের কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক উত্তরণে প্রকৃত সাহায্যটা করেছেন তাঁর কাব্যভাষা এবং আঙ্গিকের প্রয়োগে। নজরুল-পরবর্তী যুগের লক্ষণ-সম্পন্ন একটি বিকশিত কাব্যভাষার রূপ তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি। এ ভাষা শিল্পসজাগ এবং তন্ময়তায় উদ্বুদ্ধ ও পরিণত যা সফল কাব্য ভাষার একটি প্রধান চাহিদা। বোধ, বক্তব্য, স্বপ্ন এবং কল্পনা ও রুচির এক পরম মিলন হয়েছে এই ভাষার ধ্বনি উদ্ভাবনার সঙ্গে। এর শব্দ-সমাবেশ সঞ্চরণশীল এবং যদিও এতে ব্যবহৃত উপমার জগত প্রধানতঃ দরিয়া, আকাশ, মরুভূমি ও অরণ্য—এই কয়টি অঞ্চলের বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ তবু এদের আধুনিক বিচ্ছুরণ-স্বভাব (centrifugal) রয়েছে। সহজেই উপলব্ধি করা যায় এই আয়োজন পরিশীলিত এবং স্বাতিক্রমণী গুণসম্পন্ন। ভাষা ব্যবহারের ট্রাডিশনের ফল অবলীলায় তিনি আরও করেছেন এবং কাব্য ভাষায় আধুনিক সমুন্নতির তিনি অংশীদার। অবশ্যই একথা এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, সাফল্যের এই মর্যাদা 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ এবং কতিপয় সনেটের যেমন প্রাপ্য, ফররুখ আহমদের অন্যান্য কবিতার বেলায় তেমন নয়!

লক্ষণীয় যে, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর মুসলিম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতার সব গুলোই তিনমাত্রার ছন্দে রচনা করেছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদ পয়ার এবং তিনমাত্রা উভয় ছন্দেই ঐতিহ্য-একাত্ম কবিতাগুলো রচনা করেছেন। এর দ্বারা এই দুইজন কবির এইক্ষেত্রের ধারণার ভিন্নতার ও প্রয়োগের পার্থক্যও ধরা পড়ে। নজরুলের এই প্রয়োগরীতি প্রয়োজনভিত্তিক এবং তাঁর কাব্যের এ একটা বিশিষ্ট ধারা মাত্র। কিন্তু ফররুখ আহমদের এই চেতনা মজ্জাগত এবং তাঁর সামগ্রিক উৎসারণের সঙ্গেই এ জড়িত। ফলে তাঁর হৃদয়ের সকল স্পন্দনে এ ধরা পড়েছে। এ তাঁর আত্মগত অবিচ্ছিন্ন সুর—নজরুলের ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই একথা বলা যায় না!

ফররুখ আহমদের ক্যব্যে কল্পনার জগত, ধারণার জগত আকাঙ্ক্ষার জগত যতখানি রয়েছে, মনের-ইচ্ছা অনিচ্ছার, সুখ-দুঃখের, আশা ও ব্যর্থতার আনন্দ ও যন্ত্রণার জগত তেমন নেই। সে কারণে, এমন কি তাঁর মুষ্টিমেয় প্রেমগন্ধী কবিতাতেও—ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের স্পর্শ পাওয়া যায় না—তীব্রতার তো কথাই ওঠে না। অথচ মনস্তত্ত্ব-সজাগতা প্রায় প্রত্যেক আধুনিক কবিরই একটি বিশেষ গুণ এবং আধুনিক কবিতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যও এইটে!

আহসান হাবীব বাংলা কবিতার বিবর্তনের মূলধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই সুরটি সমাজ-নির্ভর। বাংলা সমাজের আলোড়ন, ক্লান্তি, অবসাদ এবং তার আকাঙ্ক্ষা, বিদ্রোহ, উদ্যোগ এবং তার আত্মগত স্বরূপের প্রতিফলনে এই ধারা পুষ্ট হয়ে চলেছে। আহসান হাবীবের কাব্য এই ধারার এমন এক যুগচিহ্নকে রূপায়িত করার প্রয়াসে উন্মুখ, যখন সঙ্কট, স্ববিরোধিতা, আশা, আস্থা আর বিদীর্ণ হতাশা একসঙ্গে বাংলা সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে! আহসান হাবীব খোলা চোখের কবি, কিন্তু সক্রিয়তা তাঁর মধ্যে কম। সে কারণে সমাজসত্যের সাধারণীকৃত (generalised) প্রাথমিক রূপটির সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি আঁকতে এবং তার পারম্পর্য-সন্ধানে যতখানি উৎসাহিত তিনি হতে পারেন, সমাজের গভীরতর পরিচয়-জটিলার মধ্যে বিচরণে তাঁর আগ্রহ ততখানি নয়। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁকে passive মনে হয়। এই উদ্‌ঘাটন-প্রবণ অথচ নির্লিপ্ত স্বভাবের পেছনে রয়েছে এক ক্ষুণ্ণ দেশাত্মবোধের সুর। ক্ষুণ্ণ অথচ সজীব, সজাগ। এইখানেই তাঁর চিত্তের লাবণ্য ঝরে পড়েছে এবং এইখানেই তাঁর কবিপ্রকৃতির স্বরূপটাও বিধৃত। অর্থাৎ আহসান হাবীব তাঁর পরিপার্শ্বকে তাঁর সমকালীন সঞ্চরণকে, যুগ-প্রবণতাকে দেখেছেন, বুঝেছেন, এর সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছেন, সহমর্মিতায় উন্মুখ হয়েছেন—কিন্তু তা নিশ্চিত একটা সীমা পর্যন্ত। যে সীমা ভাবনার দ্যোতনায় এসে মাত্র ঠেকে, তার বেশী নয়। গভীরতর বিশ্লেষণে গভীরতর দায়িত্ব এসে বর্তায়। আহসান হাবীবের কবিমন সে দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। এখানে তিনি আবর্তের নির্বিরোধ সঙ্গী মাত্র, যদিও তিনি এর স্বরূপ ও ভবিতব্যটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এই কথাগুলো আহসান হাবীবের কথায় হলো:

অশেষ আশার দিন পলাতক, আজো মিলায় নি ছায়া,
আজো দিগন্তে স্বপ্নের মতো তারি অপরূপ কায়া

স্মরণের তীরে তীর্যক হয়ে ক্লান্ত নয়নে কাঁপে,
আজো এ হৃদয় দিনের আশাতে দুঃসহ দিন যাপে।

এবং,

চেনা পৃথিবীকে ভালবাসলাম জানাজানি ছিল বাকী,
জানতাম না তো সে পরিচয়েতে ছিলো অফুরান ফাঁকি।
জানতাম না তো নিত্য নিয়ত অজস্র ডানা জ্বলে—
যে দীপ-শিখারে ভাল বাসলাম তারি দহনের তলে।
জানতাম না যে সূর্যমুখীর নয়নের আলো কেড়ে,
তারি ছায়াতলে কোটি কোটি কীট দিনে দিনে ওঠে বেড়ে।

মনে থাকে যার দহনের তৃষা তারি সেই মন জয়
সম্ভব নয়, তবু ভুল ক'রে ভালবাসতেই হয়।
মাটির গন্ধ এতই গভীর এমনি তাহার মোহ
তনুমনে আনে অনুরণনের সীমাহীন সমারোহ!
কণা কণা করে তাই তো নিজেকে পথে পথে ছড়ালাম;
কোমল মাটির স্পর্শ-প্রসাদ—সামান্যতম দান
হয়তো চেয়েছি, হয়তো কখনো ক্লান্তির অবসরে,
কামনা করেছি ক্ষীণতম চাঁদ প্রিয় সে মাটির ঘরে।

(— এই মন—এ মৃত্তিকা)

আহসান হাবীবে তাই ক্ষোভ আছে বিক্ষোভ নেই, সংক্রান্তি আছে, সেই সঙ্গে আপোষও আছে, আর আছে উত্তরণের আশা। কিন্তু এর সবই বিমূর্ত ধারণানির্ভর, প্রতিফলনমূলক। জীবনের গভীরতার সংঘাত-আশ্রিত নয়। স্বভাবতই এই ব্যঞ্জনা নম্র মনের। সেই জন্যেই মৃদুভাষিতার লাবণ্যে আহসান হাবীবের কবিচিত্ত উৎসারণের পথ খুঁজেছে। এবারক্রম্বি কবির অভিজ্ঞতাকে পরিশীলিত অভিজ্ঞতা (pure experience) বলে দাবী করেছেন। আহসান হাবীবের অভিজ্ঞতাও খুবই পরিশীলিত সন্দেহ নেই। কিন্তু একে অভিজ্ঞতা না বলে ধারণা বলাই বোধ করি অধিকতর সঙ্গত। কারণ অভিজ্ঞতায় ঘটমানতা থাকে, ধারণা সম্ভাব্যের আভাষ মাত্র। যে প্রয়াসের ফলে কবি ধারণার ভিত্তি-ভূমিতে পরিশ্রুত অভিজ্ঞতার প্রস্রবণ বইয়ে দেন, আহসান হাবীবে সেই শ্রমমুখী-নতা ততটুকু বোধ করি নেই। সে কারণে তাঁর কবিতা যতখানি নিরঙ্কুশ

ধারণায় পুষ্ট, একটি স্ববিরোধী যুগের মধ্যে তা লালিত হওয়া সত্ত্বেও, ততখানি জিজ্ঞাসায় দীর্ণ নয়। অথচ জীবনের বিকীর্ণ জটলার মধ্যেই তাঁর মনের, ভাবনার শিকড়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ঃ

(১) দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান।...

নীল অরণ্যে এল অপঘাত অকস্মাৎ
যুগের চিতায় জ্বলে জীবনের প্রিয় প্রভাত।...

দিনগুলি আজ জরতী রাতের দুঃস্বপন
চির দহনের তিক্ত শপথ করে বহন।
দিনগুলি মোর শ্বাপদ-বিজয়ী অরণ্যেতে
শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্তনাদ।
(—দিনগুলি)

(২) লাল মাটি, কালো পিচ্, শাদা নীল বালবের বুকে,
ক্রূর হাসি ফেটে পড়ে—পরাক্রান্ত যুগের নিষাদ ;
অক্লান্ত চাকার তলে বিস্মিত এ নয়ন-সমুখে
দ্বীপান্তরে এ পৃথিবী অবিরাম করে আর্তনাদ।

প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রূপ-বিক্ষত
আশা ও আশ্বাস নাই, প্রেম হেথা স্বভাব-বণিক ;
নির্মাংস অস্থির পাশে ভীড় করি কুকুরের মত,
দীর্ঘ দিন বাঁচি মোরা, জীবনেরে নিত্য দিয়া ধিক।
(—দ্বীপান্তর)

পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বিবৃতির চাইতে বেশী দায়িত্ব এই পক্তিগুলি নেয় না। সমাজ ও সময়-সত্যের রূপায়ণ এতে আছে, কবির উদ্ভ্রান্ত চঞ্চল মন এতে নেই। আহসান হাবীব স্বভাবতঃ পরিচ্ছন্নতাবাদী, সেজন্যে সত্যের কাঠামোটুকু দেখেই নির্লিপ্ত হতে চেয়েছেন। এই ডিটাচমেন্ট বা নিষ্ক্রিয়তা কবিসুলভ সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে যেন একটা পরাঙ্মুখতার স্পর্শও জড়িয়ে আছে। উপরিল্লিখিত পংক্তিগুলি থেকেই একথাও বেশ বোঝা যায় যে, আহসান হাবীব

বৈপরীত্য-সজাগ কবি। এই বৈপরীত্য-বোধ সর্বদাই রূপক এবং ইংগিতময়তার সাহায্যে সমন্বিত হয়েছে। সেজন্যে একটা সুদূর স্বগত-কথনের সুর যেন এতে ছড়িয়ে আছে, কবির সংলগ্নতা অত তীব্র হয়ে দেখা দেয় না। এতে করে একথাই দাঁড়ায় যে, প্রথমতঃ আহসান হাবীব সঙ্কটের প্রাথমিক স্বরূপটা ফুটিয়ে তুলতে যতখানি আগ্রহী, সঙ্কটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ততখানি প্রয়াসী নন। এবং জটিলাকে জেনেও তিনি শালীন থাকার পক্ষপাতী, দুঃখের যন্ত্রণার তিনি সহমর্মী বটে, কিন্তু যন্ত্রণাকে নিজের স্নায়ুতে ঠাঁই দিতে নারাজ। **প্রসঙ্গতঃ** বলা যেতে পারে ঃ

> কোথায় লুকোবে? ধু ধু করে মরুভূমি,
> ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
> আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
> নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
>
> (— উটপাখী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

যুগীয় সন্ত্রাসের এমন শিহরন তাই আহসান হাবীবে অনুপস্থিত ; এবং :

> Move on then with new desire
> For it's no man's land,
> Only the ghost can live
> Between two fires.
>
> (—Conflict, C. D. Lewis)

এর মতো এমন স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তের স্পর্শও তাঁর মধ্যে পাওয়া দুরূহ। তবে 'আজকের কবিতা'র এবং 'কনফেশান'এর নীচের উদ্ধৃতাংশে তিনি কিছুটা উচ্চকিত ঃ

> তোমার আমার দিন ফুরায়েছে যুগটাই নাকি বৈপ্লবিক
> গানের পাখীরা নাম সই ক'রে নীচে লিখে দেয় রাজনীতিক।
> থাকতে কি চাও নির্বিরোধ
> রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।
> নীড়-প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক
> আরব্ধ গান এইখানে শেষ আজকে আহত সুরের পিক।

আমাদের দিন মৃত্যু-তুহিন দীর্ঘায়ু হবে শ্যেন বিধান
শান্তিহরণ এ মৃৎ-পিপাসা চিরদিন রবে বিদ্যমান।
জঠরের জ্বালা চিরন্তন
চির ক্লেদাক্ত এই জীবন—
যুগ নিষাদের কপিশ নয়ন হানবে সেখানে দৃষ্টিবাণ।
আজকের দিনে এই ত কবিতা গানের পাখির এই ত গান।

(—আজকের কবিতা)

নিরুত্তাপ সত্যভাষণের মতো, যেন কতকটা প্রোফেটিক, সিচ্যুয়েশনটার চিত্রটাই মুখ্য। যদিও এখানে ব্যক্তিগত আভাষ আছে, কিন্তু তা নিছক শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, সমাজ-ব্যক্তিত্বে তা প্রসারিত নয়। তবে এতে যে সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেনি, তা নয়। এখানে আমার কথা হল এই যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও C. D. Lewis-এর উদ্ধৃত পংক্তিগুলোতে ইনডিভিডুয়্যাল যেমন স্পষ্ট, সামাজিক ব্যক্তিত্বের নিজস্ব উচ্চকিত আশা ও হতাশা যেমন চঞ্চল, আহসান হাবীবের ধাচটাই তেমন নয়—তিনি অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক। অথচ এ কথাও সত্য যে, অগ্রসরমান গীতিকবিতা মাত্রই একাধারে যেমন কবির মনের প্রতিফলন, তেমনি যুগের অনুরণনও তা। অর্থাৎ এতে আমরা কবির মনের ভেতর দিয়ে যুগকে পাই, যুগ-মানসকে পাই। একের মধ্যে ব্যাপককে দেখি। আমি আগেই বলেছি, বাংলা কাব্যের যে ধারা বিবর্তন ও প্রগতিতে) অব্যাহত রয়েছে আহসান হাবীব তার সঙ্গে সংলগ্ন। এবং সেইসঙ্গে একথাও বলেছি, এই ধারা সমাজ-নির্ভর। (সব দেশেই বিবর্তনপ্রবণ ধারাটি সমাজ-নির্ভর।) আহসান হাবীব সমাজের, ব্যক্তির গভীরে যেতে পরাঙ্মুখ। তবে আহসান হাবীবে যে একটা ক্ষুন্ন দেশাত্মবোধের সুর আছে, সেইটেই তাঁকে অনেকাংশে রক্ষা করেছে। যদিও প্রোফেটে যে রকম নৈর্ব্যক্তিক উদ্বুদ্ধ ধর্মবোধ থাকে এই দেশাত্মবোধও তেমনি! তবুও এই বোধেই যা কিছুটা মনোভংগীর (attitude) শিহরন রয়েছে। নইলে হয়তো তিনি বুঝি শুধু আয়নাই হয়ে রইতেন, নিরপেক্ষ, নিরুত্তাপ! এ কারণেই আহসান হাবীবে ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্র একপেশে একচক্ষুভাবে প্রধান হয়ে উঠেছে। বৈপরীত্যটা অনেকাংশে প্রথানিবদ্ধ। জীবনের দ্বান্দ্বিকতা স্বতঃস্ফূর্ত, অনিবার্য নয়। এবং ভবিষ্যতের আশাবোধও যা আছে তাও যেন কতকটা অন্ধবিশ্বাসের মত, সিদ্ধান্তটাও যান্ত্রিক, বুদ্ধিজাত, আর যার কোন পরবর্তী স্রোতও নেই ঃ

নদীর জলে ঝল্‌কে উঠবে মুক্তি,
বন্যা আসবে রেড রোডের প্রান্তে
কেননা
এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য।...
সকাল বেলার হাওয়ায় লাগবে জোর
পুরণো ধূলোরা এবার উড়বে।
(—রেড রোডে রাত্রিশেষ)

এবং

এবার এলাম
হাজার জনতা যেথা নিত্য দেয় দাম
পীতরক্তে জীবনের, সেই রাজপথে।

আজ হতে
দুর্বহ পাপের বোঝা দিনে দিনে লঘু করিবার,
প্রতিজ্ঞা আমার।
(—স্বাক্ষর)

বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝলেন, চেতনা দিয়ে যার রূপাভাস পেলেন, রুচি দিয়ে, অন্তর দিয়ে, উদ্যোগ নিয়ে তার সঙ্গে মিশতে পারলেন না। এই মনোসঙ্কটের ফলে আহসান হাবীব গীতিকবিতার (যেখানে পরিশ্রমী মনসক্রিয়তাই অর্থাৎ একান্ত নিজের মনের ব্যঞ্জনা এবং কাল-নিবিষ্টতাই অনন্য পন্থা এবং যেখানে পেনিট্রেশনের দায়িত্বটাও অপরিসীম) এই সমাজসংলগ্নতার পথটা যেন ধীরে ধীরে পরিহার করে গেলেন। পরিণতির দিকে তাঁর মনের প্রতিফলন তাই মোড় নিয়েছে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, জীবনের সনাতনী মূল্যবোধ এবং প্রকৃতিঘেঁষা জীবনায়ণের মধ্যে। অর্থাৎ প্রেক্ষিতটাকে তিনি নিরঙ্কুশ করে নিতে বাধ্য হয়েছেন! অপরপক্ষে গভীরতররূপে সমাজকে আঁকতে তিনি নিলেন গল্প-গন্ধী কবিতা এবং ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয়, যেখানে স্বভাবতঃই কবি নিজে নিবিষ্ট নন, আত্মজ প্রতিফলন যেটা নয়—দৃষ্টিভংগী ও দেখাটাই যেখানে প্রধান! —কাশ্মিরী মেয়েটি, সৈনিক, রেনকোট, একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ, কোন বাদশাজাদীর প্রতি এবং ধন্যবাদ, হকনাম-ভরসা, ছহি জঙ্গনামা প্রভৃতি এই উক্তির সাক্ষ্য দেবে! এতে যেন আহসান হাবীবের পক্ষে উভয় রক্ষা হয়েছে—তিনি স্বস্তি পেয়েছেন। জটলার ক্লেদ থেকে বেঁচেছেন অথচ এক অনিবার্য সত্য প্রকাশের দায়ও শোধ করেছেন!

উপরোক্ত বিশ্লেষণের কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়তো আছে, যেমন—খাঁচা, কনফেশান—এতে হয়তো আহসান হাবীব অগ্রসরমানতার পথ খুঁজেছেন—কিন্তু এই প্রয়াস এত সীমিত নিদর্শনের মধ্যে অবলুপ্ত যে. এই উদ্যোগের সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পেরেছেন বলে মনে করা যায় না। অপরপক্ষে নতুন পথ সন্ধানের কতকটা উত্তেজনাহীন, শিহরনহীন পথপ্রাপ্তির (এটাই হয়তো তাঁর স্নায়ুতে যথাযথভাবে খাপ খায়) কথা তো আমি বলেছিই। তাঁর এই মোড় পরিবর্তনের নিদর্শন পাওয়া যাবে উত্তীর্ণ প্রহরের গান, ক্রান্তিকাল, প্রেম-নারী-মানুষ-ঘোষণা, পুনর্বাসন, অভিজ্ঞান বসন্ত, পুতুল এবং নায়ককে প্রভৃতি কবিতায়। আহসান হাবীব সমাজ-সত্যের ব্যাপকতা ধরতে পারেন নি। সেজন্যে কনফ্লিক্টটা দেখা দিয়েছে তিনি যতটুকু ধরতে পেরেছেন সেটার সঙ্কীর্ণতা ও একঘেঁয়েমীর সঙ্গে। এ কারণেই এসেছে বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত বলেন ঃ

এ মুখোস খুলে যাক।
নিজেকে অনন্য করে
সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা করার
আপ্রাণ প্রয়াস আর
এই ঘৃণ্য ভণ্ডামীর জাল
ছিন্ন হোক।
আমাকে আড়াল করো।
আভরণ-মুক্ত হয়ে তুমি এসো
তোমার সহজ অবয়বে,
ধরা দাও সহস্র দৃষ্টির আলোয়।
(—নায়ককে)

অন্য আধারে বলা হলেও, এইটে তার জন্যে এক সাধারণ সত্য! উদ্ভিন্নমান বস্তুবিষয়ের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ জটলার চাইতে পরিশেষে নিরঙ্কুশ অবাধের প্রেক্ষিতে সঞ্চরণ তার কাছে অনেক বেশী সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে, এই সহজতাতেই অবশেষে নিজে সহজ বোধ করেছেন। সে যাই হোক, এই পালাবদলেও কিন্তু আহসান হাবীব যুগের অনুরণন এবং জীবন-সত্যের আহরণ থেকে পালান নি। সে কারণে একটা মরবিডিটির সুর আগাগোড়াই তাঁর মধ্যে উপস্থিত। কেননা, তিনি যে ভাবেই শেষ পর্যন্ত সাড়া দেন না কেন, তাঁর যাই স্খলন থাকুক না কেন, একথায় তিনি মূলগতভাবে বিশ্বাসী ঃ

> Poetry is a function of life; and life being the continuous operation of a force or a complex system of forces, poetry must, like all other vital functions, share this quality of movement, of existing in and manifesting itself through movement. Poetry is an interpretation of life; and the interpretation must, like the thing interpreted, be organic and in continual progress, taking form from point to point, from moment to moment.

আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতাগুলো ভাব-ঐশ্বর্যপূর্ণ হলেও, সেই নৈর্ব্যক্তিকতার দরুনই সেগুলোকেও যান্ত্রিক ও ছকে ফেলা বলে মনে হয়। মনে হয় প্রস্ফুটিত নয়, ধারণাসঞ্জাত।

রেঁনেসা ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রশ্নাতীতরূপে স্বীকৃত ও বহুচর্চিত মূল্যবোধ-সমূহ বিশ শতকের আধুনিক কবিদের মনের আস্থায় আর ঠাঁই পায় নি। ত্রিশের যুগের বাঙালী কবিদের মধ্যে এই চিত্র আমরা দেখেছি—এই বিশ্রুত তথ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ধারণাগতভাবে প্রধানতঃ পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে সূচিত হয়েছে: নঙর্থকতা, সংশয়, জিজ্ঞাসা, নিষ্করুণ নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা এবং সৃজনসম্ভাবী ভাঙনে উৎসাহ। এই রকম কোন একটা নিশ্চিত মনোভংগী থাকার দরুণ স্বভাবতঃই এই ধারার কবিতাগুলো বিশ্লেষণধর্মী, যুক্তিবাদী এবং নিবিষ্ট।

অপরপক্ষে এই নিবিষ্ট স্বভাব কবিতাকে বিষয়ী করে তুলেছে, জীবন আচরণের প্রাধান্য ঘটিয়েছে উপকরণে এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিতাকে সর্বার্থে স্বাভাবিক করার জন্যে কবিতার ভাষাকেও স্বাভাবিক কথ্য ভাষারীতির দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। অবশ্য সকল কাব্য বিশেষজ্ঞই কবিতার ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য ও স্বীকার করেছেন। এমন কি আধুনিকতার একজন বিশিষ্ট সচেতন পথিকৃৎ এজরা পাউণ্ডও কাব্যভাষার তিনটি বিশেষ গুণের কথাই বলেছেন: melopeia, phanopeia এবং logopeia—মন্ত্রগুণ, সংগীত-গুণ এবং ভাষার স্বাভাবিক কথ্য-বাচনগুণ। সে যাই হোক কবিতার স্বতন্ত্র ভাষা-স্বভাব ও প্রকৃতি সর্বদাই অটুট থাকা সত্ত্বেও, আধুনিক কাব্যের বেলাতে যেমন এই তৃতীয় গুণটি অর্থাৎ logopeia বা কথ্যভংগীর গুণটি এত প্রাধান্য পেয়েছে তেমন পূর্বে কখনো পেয়েছিল বলে প্রমাণ নেই। এইটে অবশ্য এজরা পাউণ্ডের নিজস্ব সচেতন সক্রিয়তারই আভাষ বহন করে এবং পারম্পর্যক্রমে আধুনিক কবিতাও

এই তৃতীয় গুণটির প্রতি অধিকতর প্রবণতাশীল হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভাষার স্বাভাবিকীকরণ কাব্যভাষার সঙ্গে কথা ও গদ্য ভাষারীতির পার্থক্য বিলীন করে দেয়নি, বরং এইটে আধুনিক কবিতার ভাষাকেই পূর্বতন কাব্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণে আধুনিক কাব্যভাষা নতুন আদল পেয়েছে। অপরপক্ষে স্বাভাবিকীকরণের এই মানসিকতার দরুণই, মালার্মে যেমন কবিতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন, আধুনিক কবিরা তেমন আর চাইলেন না। তাঁরা কবিতাকে করে তুলতে চাইলেন প্রবহমান স্রোতের এক একটি বিচ্ছুরণ-খণ্ড।

সহজেই লক্ষ্য করা যায় নতুন কোন মূল্যবোধ নয়—বরং নতুন মূল্যবোধ-কামী গঠনসূচীর পর্যায়ে এই পরিবর্তনসমূহ সূচিত হয়েছে। ত্রিশ পরবর্তী যুগের আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের হিসেব নিকেশে একথা বোধহয় এখন স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, নতুন কোন মূল্যবোধের উদ্ভব এই ধারায় হয় নি। কিন্তু সে কথা প্রমাণের ক্ষেত্র এইটে নয়। এখানে আমার কথা এই যে, কবিতায় মূল্যবোধের পরিবর্তন আনা সম্ভব না হলেও তথা নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব না হলেও, ত্রিশের যুগের নতুনত্বকামী উৎসারণে মনোভংগীর ক্ষেত্রে যে নিদারুণ পরিবর্তন এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেছে, ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে এবং এইসবকে কার্যকরী করার জন্যে সবচেয়ে বেশী পবিবর্তন ঘটেছে আঙ্গিকের। কাব্যভাবনাকে কিভাবে সংগঠিত করবেন সেইটে একটা প্রধান দায়িত্ব হিসেবে আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কবিতা vers donnis বা প্রেরণাগত এবং verse calculis বা পরিকল্পনাগত হতে পারে। কি প্রেরণায় নিলেও পরিশ্রমে তা সংঘটিত করাতেই তাঁরা অধিকতর সৃজন-স্বস্তি বোধ করেন। পরিবেশ-আক্রান্ত ভাবধারাকে নিজস্ব ভাবধারায় ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তাঁদের সচেতন ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা পায়, তাঁদের বিশ্লেষণী স্বভাব সবচেয়ে বেশী সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ পায়। এই কারণেই লক্ষ্য করা যায় আধুনিক কবি সর্বত্রই তাঁর অনুভূতি, আবেগ ও বক্তব্যকে একটি situationএর মধ্যে সংস্থাপিত করার পক্ষপাতী। situation-এর কাঠামোর এমন অপরিহার্য প্রয়োজন বোধ করি কবিতার অন্য কোন যুগে উপলব্ধ হয় নি। এই পরিস্থিতি-সজ্ঞানতা ব্যক্তি বা কাল বা সমাজ বা এদের মিশ্রিত ধারণার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সব

ক্ষেত্রেই আধুনিক কাব্যে প্রথম আবশ্যকতা হল একটি সম্পূর্ণ ধারণাকে একটি নিশ্চিত পরিস্থিতির আদলে ফেলা। এর ফলেই আধুনিক কবিতার পরিবর্তন-প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশী চাপ যার ওপর পড়েছে সেটা হল আঙ্গিক। এবং সেজন্যেই একজন আধুনিক কবি এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যে, 'আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)! কথাটা যে প্রয়োগশালার হাতেনাতে বোঝাপাড়ার পরীক্ষায় জন্ম নিয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

পূর্ব পাকিস্তানের উদ্যোক্তা আধুনিক কবিদের মধ্যে সম্ভবতঃ আবুল হোসেনই আধুনিক কবিতার এই পরিবর্তিত মৌল স্বভাবটি সবচেয়ে ভালো বুঝতে পেরেছিলেন। আবুল হোসেন individualism এ বিশ্বাসী। সমসাময়িকতাকে তিনি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলনের মধ্যে ধরতে চেষ্টা করেছেন। আহসান হাবীব যেখানে প্রধানতঃ সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সার্বভৌম প্রতীকের মাধ্যমে তার ধারণাকে ব্যক্ত করেন সেক্ষেত্রে ব্যক্তির মনন-আলোড়নই আবুল হোসেনের একান্ত অবলম্বন। সেকারণে প্রেরণার চাইতে পরিকল্পনার গুরুত্বই আবুল হোসেনের কাছে বেশী, নিছক আবেগের চাইতে বিশ্লেষণজাত ঐকান্তিক তাৎপর্যের মূল্য অধিকতরভাবে তাঁকে আকৃষ্ট না করে পারে নি। কেননা প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত আলোড়ন সব সময়েই তাঁকে পরিবেশের নির্যাসে পুনর্গঠিত করে নিতে হয়, পরিস্থিতির কাঠামোয় তা নিজস্ব রুচি ও মনোভংগী অনুগ করে পুনঃসজ্জিত করে নিতে হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও কাব্য-ভাবনার বিকাশের ক্ষেত্রে আবুল হোসেনের প্রধান অসুবিধেটে হল এই যে, তাঁর বিচরণের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ : তাঁর অভিজ্ঞতার উপকরণ সংক্ষিপ্ত এবং মনন-প্রতিফলনও যেন কতিপয় একান্ত পরিচিতি স্থায়ী আশ্লেষের মধ্যেই অন্তরীণ থাকতে ভালোবাসে। আবুল হোসেন দীর্ঘকাল ধরে কবিতা লিখছেন। ১৯৪০ সনে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নব বসন্ত' বের হয়। এরপরে যদিও তাঁর আর কোন মৌলিক কাব্যগ্রন্থ বেরোয় নি, তিনি লিখে চলেছেন অবিরতই! এই দীর্ঘকালীন সক্রিয়তাও কিন্তু উপরোক্ত মন্তব্যকে খণ্ডন করার মত কোন উপকরণই আমাদের হাতে তুলে দেয় না! ফলে তাঁর পরবর্তীকালের অনেক কবিতাই অভ্যাসের সচ্ছল অবদান বলে মনে হয়—পরিশ্রমে শালীন, কিন্তু আন্তরিকতায় স্পন্দিত নয়। অথচ 'নব বসন্তে'র এবং তার পরের অনেক কবিতাই প্রভাব ও সৃষ্টিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক সজীব বলে মনে হয়। এইজন্যই বোধ করি কবি-আয়ু এবং কাব্য-ভাবনার গতিশীলতা পরস্পরের পরিপূরক!

আবুল হোসেন প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত মনের রূপকার। মধ্যবিত্ত স্বভাব ও জীবনকে প্রকাশ করার দিকেই তাঁর প্রবণতা। এক্ষেত্রে তাঁর দ্বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়ঃ কোথাও তিনি নিশ্চিত বক্তব্যে উচ্চকিত, আবার কোথাও তিনি নির্লিপ্ত ব্যঙ্গে নিষ্করুণ। নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কথাটি না বলে আমি নিশ্চিত বক্তব্য কথাটি বিশেষ করে বলতে চাই। বলতে চাই এজন্য যে, মধ্যবিত্ত স্বভাবের মতই তিনি তাঁর উদ্ঘাটনে সিদ্ধান্তকে পরিহার করতে চান সর্বত্রই—এ তথ্য একান্তই লক্ষযোগ্য।

তাঁর একটি কবিতাতে এমন নিশ্চিত বক্তব্য সবচেয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে ঃ

মৃত্যুঞ্জয় মুক্তির আগুন

জ্বলন্ত ফাল্গুন আনে শুক শীর্ণ মনে,
দুরন্ত পবনে ধু ধু জ্বলে ওঠে ধূমায়িত জ্বালানীর কাঠ
মহান মৃত্যুর মুখে। আর নয়, এই ধুকে ধুকে
তিলে তিলে প্রাণক্ষয়. বিস্বাদ বিষণ্ণ বেঁচে থাকা
রে বিহঙ্গ, রে বিহঙ্গ মোর, মুক্ত করো পাখা।

(—একটি অসমাপ্ত কবিতা)

জ্বলন্ত বক্তব্য, এমন সুস্পষ্ট দৃপ্ত অভিব্যক্তি আবুল হোসেনের কাব্যে আর খুব বেশী নেই। "কর্ম" ও "শেষ যুক্তি" কবিতাদুটো অবশ্যই এ-পর্যায়ে পড়ে। একে হঠাৎ সিদ্ধান্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার হবে যে, এই উক্তির বিমূর্ত মৃত্যু বা ত্যাগ ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নেই এবং কাজেকাজেই এ লক্ষ্য concrete নয় এবং মনেরই হঠাৎ জাগার মত এবং এর ধারা রক্ষার কোন মনোভাব বা সচেতনতাও মধ্যবিত্ত স্বভাব-অনুযায়ীই লক্ষ্য করা যায় না। এ কারণে একে আমি সিদ্ধান্ত বলতে চাই নে। উপরোক্ত জ্বলন্ত বক্তব্য আবুল হোসেনের উৎসাহ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিম্নে উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের মধ্যেই আবুল হোসেনের মধ্যবিত্ত চারিত্র দ্ব্যর্থহীনভাবে বিধৃত ঃ

মাঝে মাঝে মনে হয়
একটু একটু করে এই প্রাণ ক্ষয়
না করলেই নয়।
দিনে দিনে তিলে তিলে মরে মরে এই বেঁচে থাকা
এর মানে কী।

মগজের বহ্নি বাষ্প শহরে পল্লীতে ছড়ায়ে দি।
তারপর শীতল মুহূর্তে
ফিরে আসি ঘরে
অন্ধকারে সলিতা হাতড়াই
শূন্য চোখে চেয়ে থাকি মুষিক বিবরে
আর মনে মনে আওড়াই
যে যাবার যাক
আমাদের থাক এই মরে মরে বেঁচে থাকা।
আমি ফাঁকা মধ্যবিত্ত এক।
(—ফাঁকা মধ্যবিত্ত)

এবং,

আমরা পাই নি তৃপ্তি উড়ন্ত ডানায়
আমরা পাই নি তৃপ্তি স্বপ্ন-সুষমায়
আমরাও স্বপ্ন দেখি। তারা পচে মরে
শতাব্দীয় সব হারায়, বন্দরে কবরে।
(—স্বপ্ন)

এ বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। অধিকতর পরিষ্কারভাবে মধ্যবিত্ত স্বরূপও এখানে উদ্ঘাটিত। ধীরে ধীরে এই মনোভংগীই আবুল হোসেনে স্থায়িত্ব পেয়েছে। উত্তপ্ত বক্তব্যে, সিদ্ধান্তের কাছাকাছি ভাষায় তিনি প্রথম দিকে যেমন মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয়েছেন, তাঁর মনোভংগী তেমন সক্রিয়তায় আর উজ্জীবিত হতে চায় নি। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এমন স্পষ্ট কথায় স্বরূপ তুলে ধরেও মাত্র আবুল হোসেন তৃপ্ত হতে পারেন নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই স্বরূপের স্থায়িত্বকে ব্যঙ্গ শুরু করেছেন। আমি এই মনোভাবকেই বলতে চেয়েছি, নির্লিপ্ত ব্যঙ্গে নিষ্করুণ। এই ধরনের কবিতার সংখ্যাই আবুল হোসেনের বেশী এবং এখানে যেন তিনি অনেকটা অবারিত ক্ষেত্র পান, অধিকতর সহজতা ও স্বস্তি পান। এ ধরনের কয়েকটা উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

রাতের ফ্ল্যাটের থাবা, আপিসের দেয়াল পেরিয়ে
মাঠের সবুজে চোখ
কখনো কখনো
গড়াগড়ি দেয়, আজও
দিনের রাতের যত হোঁচট এড়িয়ে

ছুটির মেলার ভীড়ে আঁচল ওড়ানো ছবি দেখে
বুকের বিকেল ভরে সিনেমার গানে
বউ-এর ছেলের কান্না ভুলে মাঝে মাঝে
সিগারেট ধরিয়ে নি গলির দোকানে—
এর চেয়ে আশ্চর্য কী আছে ?
(—কিমাশ্চর্যম)

এবং,

শুধু বেঁচে আছি। শত্রুর মুখে
ছাই দিয়ে আজো বস্তি কিনা ঠাঁই
ভাবো বসে তুমি। আমি ক্ষেতে ঢুকে
যেখানে যা পাই খানিক সরাই।
(—নায়ক)

এবং,

আমাদেরও দেশ আছে।
আহা কি সরস মাটি।
এমন বাতাস কোন্ দেশে।
আমাদের গান মেশে
উত্তরে পশ্চিমে পূবে চলতি হাওয়ায়
আওয়াজে ছড়ায়
দেশে দেশে, আমাদের প্রাণের স্বদেশ।
আমাদেরও দেশ আছে
গানে গানে গল্পে ও গাঁথায়
ম্যাপের পাতায়।
(—স্বদেশী কোরাস)

ইত্যাদি। যে সক্রিয়তার আনন্দে মধ্যবিত্ত মন জ্বলতে পারে না স্বাভাবিক কারণেই, এই ধিক্কারের যন্ত্রণায় সেই অক্ষমতার গ্লানি যেন অনেকটা দূর হয়ে যায়। এ, এক পরোক্ষ স্বস্তি, বাঁচবার পাথেয় —আবুল হোসেনের কাছে এ তথ্য অজানা নয়— এই ধরনের কবিতাগুলোই একথা বলে দেয়।

লক্ষণীয় যে, আহসান হাবীবে আমরা যেমন একটা গণবোধ দেখি আবুল হোসেনে তা নেই। এর কারণ আমি পূর্বেই বলেছি, আহসান হাবীব সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ আর আবুল হোসেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ। ফলে আবুল হোসেনে গণতন্ত্রের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করি আর আহসান হাবীব (অবশ্য 'রাত্রি

শেষে'র যুগ পর্যন্ত) নতুন উত্তরাধিকারের মুখাপেক্ষী। এবং যেহেতু গণতন্ত্র বিশ শতকের মাঝামাঝি কালে একাধারে চূড়ান্ত পরিকর্ষণে সমৃদ্ধ ও ক্লান্তি-চিহ্ন আক্রান্ত সেজন্যে আবুল হোসেনের কাব্যেও ব্যক্তির crisis-এর প্রতিফলনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বৈদগ্ধের পরিচয় অত্যন্ত অবিমিশ্র! এই অনন্যসাধারণ বৈদগ্ধের গুণটি অবশ্য অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে'র মাধ্যমেই বাংলা কাব্যে প্রথম প্রতিফলিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের আলোচ্য এই তিনজন আধুনিক কবির মধ্যে আবুল হোসেনের প্রেমের কবিতাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও genuine বলে মনে হয়। বোধগম্য কারণেই আহসান হাবীবের প্রেমের কবিতায় প্রেমই একমাত্র লক্ষ্য নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আবুল হোসেনের লক্ষ্যের খাঁটিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অথচ তা ভাবসর্বস্ব নিছক প্রেম-বিহ্বলতার নিদর্শনও হয়ে ওঠে নি, কারণ তা একটি পরিকর্ষিত ব্যক্তিমনের প্রতিফলনপুষ্ট, বিশেষ করে, এই মনের বৈদগ্ধের ছায়াও তাতে পড়েছে। যেহেতু এই মন একান্তই সমসাময়িকতার গুণসম্পন্ন, সেজন্যে এই প্রেমের কবিতাগুলোতে নানা দিক থেকেই সমসাময়িক রুচি ও বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। আর একটি বিষয়ে আবুল হোসেন আলোচ্য তিনজন কবির মধ্যে সর্বাধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। সেটা হল কবিতার ভাষায় কথ্যরীতির প্রয়োগ। এই প্রচেষ্টা আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই আবুল হোসেনের মনোযোগ এদিকে সহজাতভাবেই আকৃষ্ট হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে এই রীতি তিনি অনুসরণও করেছেন। কিন্তু তবু এখানে একথা না বলে উপায় নেই যে, এতে তাঁর অনেক কবিতাতেই কথ্যগুণ প্রাধান্য পেলেও মন্ত্রগুণ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবু এই প্রচেষ্টার প্রয়োজন অপরিহার্য এবং অসাফল্য সফলতারই প্রতীক্ষা করে মাত্র—এ থেকে সরে আসার প্রশ্ন কোন ক্রমেই ওঠে না!

এঁদের সমসাময়িক আর যে কয়জন কবি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সৈয়দ আলী আহসান, সিকান্দার আবু জাফর, তালিম হোসেন, সানাউল হক, সৈয়দ নূরুদ্দিন, মতিউল ইসলাম, আবদুল গনি হাজারী এবং হাবীবুর রহমান। এঁরা সবাই উপযুক্ত আলোচনার অপেক্ষা রাখেন। কেননা বিশেষ করে এঁদের মধ্যে অনেকেরই সক্রিয় চর্চায় পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য নিয়ত লাভবান হয়ে চলেছে।